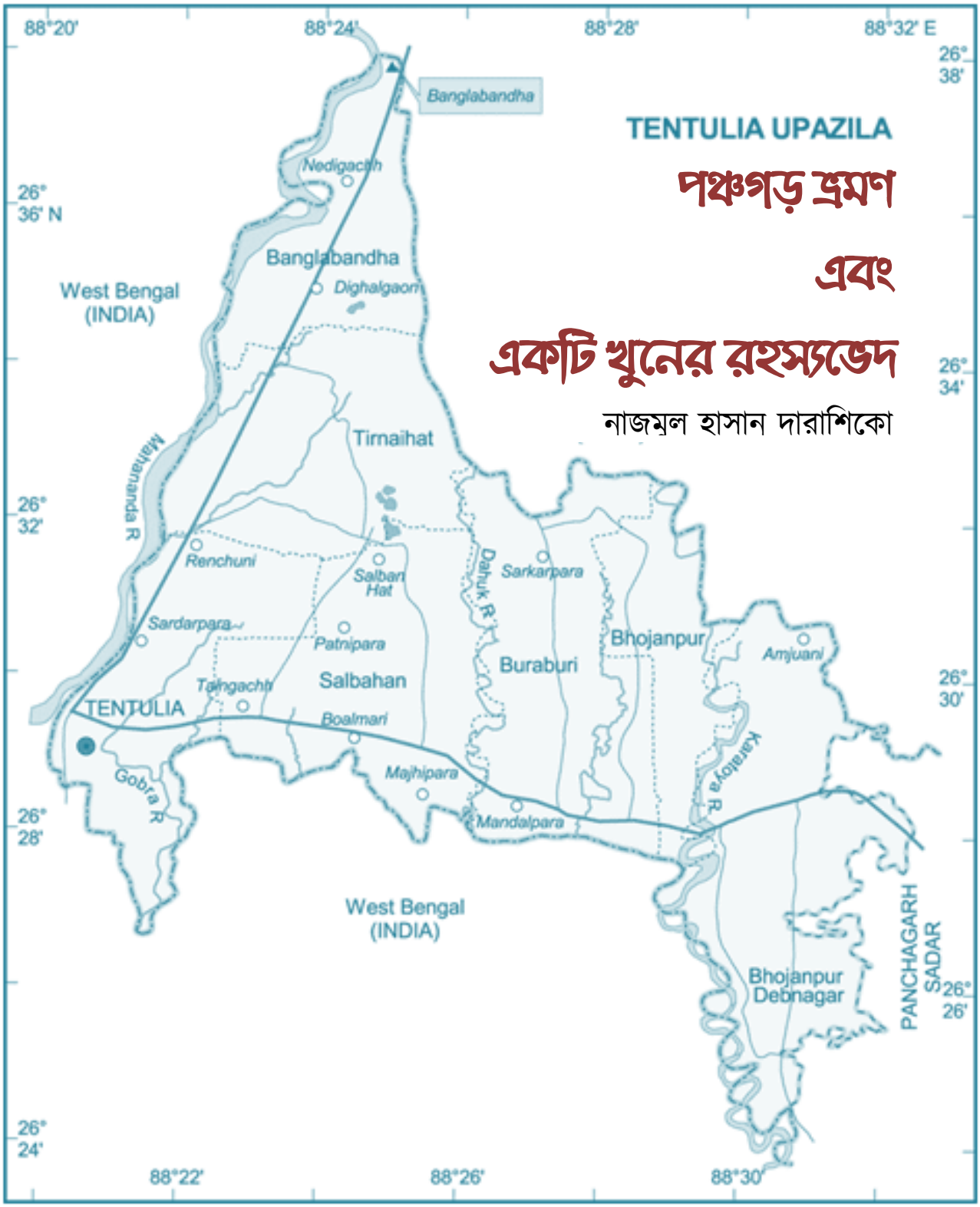

TENTULIA UPAZILA

পঞ্চগড় ভ্রমণ এবং একটি খুনের রহস্যভেদ

নাজমুল হাসান দারাশিকো

ইবুক
পঞ্চগড় ভ্রমণ এবং একটি খুনের রহস্যভেদ
লেখক
নাজমুল হাসান দারাশিকো

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১৮
প্রকাশক ও স্বত্ব : লেখক

যোগাযোগ : darashiko@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.darashiko.com

Ebook
Panchagarh Bhraman Ebong Ekti Khuner Rohossyobhet

Writer
Nazmul Hasan Darashiko

First Published
February 2018

সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত, কিন্তু সকল ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক নয়। লেখক।

পঞ্চগড় ভ্রমণ এবং একটি খুনের রহস্যভেদ

'ইসলামের একটি আদব হল ঘরে ঢোকার সময় সালাম দেয়া, এমনকি ঘরে যদি কেউ নাও থাকে তখনও, জানেন এটা?' - প্রশ্ন করল শোয়াইব, ওর হাতে মাঝারি সাইজের তালার একটি চাবি।

এই তথ্য আমার জানা ছিল না, মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিলাম। 'কিন্তু হঠাৎ এই কথা কেন?'

'কারণ আজ এই ডাকবাংলোতে অতিথি কেবল আমরা দুজন' - হাতের চাবিটি দিয়ে ডাকবাংলোর দিকে নির্দেশ করলো শোয়াইব।

এই ঘটনা মঙ্গলবারের, ক্যালেন্ডারের তারিখ ৫ ডিসেম্বর ২০১৭। গত রাত আটটায় নাবিল পরিবহনের চেয়ারকোচে যাত্রা শুরু করে আজ সকাল সাতটায় পঞ্চগড় নেমেছি আমি আর শোয়াইব, উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা ভ্রমণের মাধ্যমে দারাশিকোর বঙ্গভ্রমণের সমাপ্তিকে আরেকটু এগিয়ে নেয়া। পঞ্চগড় ভ্রমণ শেষে আর মাত্র ছয়টি জেলা বাকী থাকবে, তার বেশিরভাগই দক্ষিনবঙ্গে।

এই যাত্রায় আমার সঙ্গী শোয়াইব। সে বেসরকারি চ্যানেল যমুনা টেলিভিশনের বিজনেস রিপোর্টার। শোয়াইবকে নিয়ে এটি আমার তৃতীয় ভ্রমণ। এর আগে মেহেরপুর এবং গাইবান্ধা-জামালপুর আমরা একসাথে ভ্রমণ করেছি। শোয়াইবের সাংবাদিক পরিচয়ে আমার বেশ সুবিধা হয়। এক নামে সবাই চিনতে পারে, সাংবাদিকরা সাধারণত নাম ভাঙ্গিয়ে যে সব সুযোগ সুবিধা পায়, সেগুলো পাওয়া সহজ হয়। তবে সবসময় এই সুবিধা পাওয়া যায় তা না, যেমন এই ডাকবাংলোর রুম ম্যানেজ করতে সেলিম ভাইয়ের সহায়তা নেয়া লাগলো।

সেলিম ভাই হলেন যমুনা টেলিভিশন এবং একই গ্রুপের যুগান্তর পত্রিকার পঞ্চগড় জেলা প্রতিনিধি। শোয়াইব আসার আগেই তার সাথে যোগাযোগ করে রেখেছিল। সকালে পঞ্চগড় শহরে হোটেল মৌচাকের সামনে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। মাঝবয়েসী হাসিখুশি মিশুক ভদ্রলোক সেলিম ভাই। চোখে ফটোসানগ্লাস ব্যবহার করেন। পানের দোকানি থেকে শুরু করে ডিসি - সবার সাথেই তার সুসম্পর্ক। দেশের বড় বড় প্রায় সব দৈনিকে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তবে সাংবাদিকতা তার ভালোবাসার জায়গা। সামান্য যা বেতন পান তা দিয়ে চা-সিগারেট খাওয়া, যাতায়াত আর অতিথিদের আপ্যায়নেই ব্যয় করেন। সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পারিবারিক জমিজমার উপর নির্ভর করতে হয় তাকে।

সেলিম ভাই শোয়াইবের সাথে কথা বলার পরেই ইউএনও সাহেবের সাথে কথা বলে একটি রুমের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমাদের সামনেই ফোন করলেন, ইউএনও সাহেব জানালেন রুম পাওয়া যাবে, নাজির সাহেবের সাথে যোগাযোগের নাম্বার আর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দিলেন। শোয়াইব কল দিয়ে পরিচয় দিল, নাজির সাহেব জানতে চাইলেন - কোন ভবনে রুম চাই আমাদের - নতুন না পুরাতন। শোয়াইব জানালো

পুরাতন ভবনে রুম পাওয়া না গেলে নতুন ভবন। নাজির সাহেব বাংলোর কেয়ারটেকার সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে বলে ফোন ছাড়লেন।

এই কথোপকথন আজ সকাল সাড়ে দশটার। এখন বেলা আড়াইটা, আমরা মাত্র তেঁতুলিয়ার ডাকবাংলোর চাবি বুঝে পেয়েছি।

এই ভ্রমণে আমার বরাদ্দকৃত সময় মাত্র দুইদিন। এই দুইদিন হল আমার অন্ত:বর্তীকালীন স্বাধীন পিরিয়ড। গত বৃহস্পতিবার আমার প্রায় ছয় বছরের কর্মস্থল থেকে বিদায় নিয়েছি আমি। রবিবার ব্যয় করেছি নতুন কর্মস্থলে যোগদানের প্রস্তুতির জন্য, সোমবার ব্যয় করেছি স্মার্ট কার্ড উত্তোলনকার্যে। আগামী বৃহস্পতিবার ৭ ডিসেম্বর সকাল দশটায় নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে হবে। মাঝের এই দুইদিনের স্বাধীনতায় বঙ্গভ্রমণ করে নিচ্ছি।

রকস মিউজিয়াম

তেঁতুলিয়ায় আসার আগে আমরা আরও তিনটি জায়গা ঘুরে এসেছি। সকালে নাস্তা করে গিয়েছিলাম রকস মিউজিয়ামে। পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজের একটি ভবনের নিচতলায় একটি বড় কক্ষে অত্যন্ত অযত্ন আর অবহেলায় সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র রকস মিউজিয়াম অবস্থিত। রকস মিউজিয়ামের সাথে রক মিউজিকের কোন সম্পর্ক নেই। এটি হল পাথরের যাদুঘর। পঞ্চগড়ের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন

ধরনের পাথর দিয়ে এই যাদুঘর সজ্জিত। এই কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. নাজমুল হকের উদ্যোগে ২০০০ সালে রকস মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের ব্যবধানে গাছ থেকে রূপান্তরিত পাথর, বালু থেকে রূপান্তরিত পাথরসহ বিভিন্ন রকমের পাথর রয়েছে এই যাদুঘরে। যাদুঘরটি ছোট, তাই বিশাল আকৃতির পাথরগুলোর জায়গা হয়নি যাদুঘরে। সেগুলো রাখা হয়েছে বাহিরে, খোলা আকাশের নিচে।

ভেতরে রয়েছে ছোট আকারের কিছু গাছপাথর। বেশিরভাগ বস্তুরই কোন বর্ণনা বা ইতিহাস নেই। গোবরের পদ্মফুল নামের একটি নির্দেশিকা থাকলেও নেই কোন পদ্মফুল। কলেজের একজন কর্মচারী ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি জানালেন, দর্শনার্থীরা পদ্মফুলটি ধরতে ধরতে নষ্ট করে ফেলেছে। আরও জানালেন, আগে সব পাথরই বাহিরে ছিল। পরে এই কক্ষে সাজানো হয়, উদ্যোক্তা সেই ড. নাজমুল হক স্যার। তালাবদ্ধই থাকে এই কক্ষ, দর্শনার্থী এলে খুলে দেয়া হয়।

মাটির তৈরি হিন্দু ধর্মাবলাম্বীদের বিভিন্ন দেবদেবীর ক্ষুদ্রাকৃতির মূর্তি রয়েছে সংগ্রহশালায়। রয়েছে তীর ধনুকসহ বিভিন্ন দৈনন্দিন যন্ত্রপাতি। প্রায় ত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্যের দুইটি ডোঙ্গা (নৌকা) রয়েছে যাদুঘরে। ধারণা করা হয় শাল গাছের তৈরি এই নৌকাগুলোর বয়স তিন-চারশ থেকে হাজার বছরের মধ্যে। ১৯৯০ সালে তৈরি বাঁশের বেড়ার উপর খোদাই করা শিল্পের একটি নমুনাও সংরক্ষিত আছে এই যাদুঘরে। এই সকল মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণসমূহের পাশাপাশি কলেজের এক শিক্ষার্থীর সুঁই-সুতোয় আঁকা তাজমহলের একটি ছবিও দেয়ালে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে।

পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজের একটি ভবনের নিচতলায় একটি বড় কক্ষে অত্যন্ত অযত্ন আর অবহেলায় সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র রকস মিউজিয়াম অবস্থিত। তার সামনে দাঁড়িয়ে শোয়াইব, ক্যামেরার পেছনে আমি।

মিউজিয়ামে প্রবেশের আগে কলেজের একদম প্রবেশপথেই একজন স্থানীয় বাসিন্দার সাথে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, জাদুঘরের জৌলুস হারিয়ে যেতে শুরু করেছে কলেজ সরকারি হওয়ার পর থেকেই, যেন সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষনের দায়িত্ব কেবল সরকারের। বের হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল শুধুমাত্র উদ্যোগের অভাবে এই দেশের মানুষ কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে।

ভিতরগড়ের চা বাগান

রকস মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে সেলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করলাম। তিনি বাসে তুলে দিলেন। বাস আমাদের নামিয়ে দিল বোর্ডবাজারে। সেখান থেকে আমরা অটোতে উঠলাম, যাবো ভিতরগড়ে। সেলিম ভাই অবশ্য বলে দিয়েছেন ভিতরগড় থেকে একটু ভেতরে গেলে স্যালিল্যান টি এস্টেট, দরকার হলে ঘুরে দেখতে পারি। ম্যানেজারকে সেলিম ভাইয়ের নাম বললেই চিনবে।

অটোচালক ছেলেটার বয়স কম। আমাদেরকে 'পাতির বাগানে' নিয়ে গেল সে। ভিতরগড় থেকে আরও ভেতরে, পাকা রাস্তা শেষ হয়ে মাটির রাস্তা ধরে যেতে হয় চা বাগানে। বাগানে যে কেউ যেতে পারে, বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন পরে না, কেউ অনুমতি চাইলে সাথে সাথেই পাওয়া যায়।

সমতল ভূমির চা বাগানের সাথে আমাদের পরিচয় নেই। আমরা চা বাগান বলতে শ্রীমঙ্গল আর সিলেটের চা বাগান বুঝি। ছোট ছোট টিলার উপরে চা বাগান। সকল গাছের আকৃতি সমান। চায পাতা তোলার সুবিধার্থে গাছগুলোকে ছেটে খাটো রাখায হয়। কামিনরা পিঠে ঝুড়ি বেঁধে গাছ থেকে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি সংগ্রহ করেন। এ জ্ঞান আমরা পেয়েছি বাংলা দ্বিতীয় পত্রে রচনা মুখস্ত করতে গিয়ে। আর যা শিখেছি তা হল -'চা গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মরে যায়, এ কারণে ঢালু জমিতে চায়ের চাষ করা হয়'। পঞ্চগড়ের চা বাগান

এর ব্যতিক্রম। এখানকার সমতল মাটি চা চাষের জন্য খুবই উর্বর বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত দুই দশক ধরে হাজার হাজার একর জমিতে চায়ের চাষ হচ্ছে, প্রতিদিন নতুন নতুন জমিতে চায়ের বাগান হচ্ছে।

মুখস্ত বিদ্যার কারণে হোক আর অনভ্যস্ততা, সমতল ভূমির চা বাগান আমাকে খুব বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি। যতদূর চোখ যায় চা বাগান দেখা যায়। বাগানের মাঝে পায়ে হাঁটার পথ রয়েছে। চা গাছের মাঝে এবং কিনারে সারি ধরে গাছ লাগানো আছে, সেগুলো ক্লান্ত কুলি-কামীনদের ছায়া প্রদান করে। বাগানের প্রান্তে নদী, নদীর ওপারেই ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা। ভারতের সীমান্ত জুড়েও চায়ের বাগান। স্যালিল্যান চা বাগানে আমরা অবশ্য কাউকে পাতা তুলতে দেখিনি। ঘড়িতে তখন প্রায় বারোটা, পাতা তোলা শেষে সবাই ঘরে ফিরে গেছে।

অটোচালককে ভাড়া দিয়েই আমরা বাগানে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু সে থেকে গেল। আমাদের সাথে বাগানে ঘুরল। ওর নাম মোহাম্মদ জাফর। ওর গাড়ির নাম মুক্তিযোদ্ধা পরিবহন। বিস্তর আলাপ হল তার সাথে। ২০১২ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর সে আর পড়াশোনা করেনি। বাবা মুক্তিযোদ্ধা, ২০০৪ সালে মারা গেছেন। গত বছর পর্যন্তও তারা নারায়নগঞ্জে থাকতো। জাফর চাকরি করত একটা গার্মেন্টসে, বেতন ছিল ৭০০০ টাকা। আমি তাকে বলি এত কম হয় কিভাবে? সরকার তো সর্বনিম্ন বেতন নয় হাজার টাকা ঠিক করে দিয়েছে। এই কথায় জাফর হাসে, বলে, সে শুরু করেছিল সাড়ে তিন হাজার টাকায়। চার বছরে বেড়ে সাত হাজারে পৌছেছে।

রাজধানী ছেড়ে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেন এসেছে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর জাফর দিতে পারেনি। তার মা চলে এসেছে এখানে। এই পঞ্চগড়েই তার নানাবাড়ি। দাদাবাড়ি কুমিল্লায় কিন্তু সেখানে থাকা হয়নি কখনো। মুক্তিযোদ্ধা বাবার সার্টিফিকেট আছে, প্রতি তিনমাস অন্তর ত্রিশ হাজার টাকা ভাতা পায় তার মা। সরকার একটি দুই রুমের ঘর তুলে দিয়েছে এখানে। মা'কে নিয়ে সেখানেই থাকে অবিবাহিত জাফর। গাড়ি কিনেছে গত কোরবানির ঈদের পনেরো দিন আগে - ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে। দুই লাখ টাকা ঋণের মধ্যে এক লাখ ষাট খরচ হয়েছে গাড়িতে। ঋণ কবে বা কত কিস্তিতে শোধ হবে, জাফর তা জানে না, কেবল জানে প্রতি তিনমাসে পনেরো হাজার টাকা কেটে নিবে ব্যাংক।

ভিতরগড় দুর্গনগরী

চায়ের বাগান থেকে জাফর আমাদের নিয়ে গেল ভিতরগড় দুর্গনগরীতে। নামেই দুর্গনগরী, বাস্তবে এখন ইটের তৈরি বাড়ির ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছু নেই। সামনে রয়েছে মহারাজার দিঘী নামে পরিচিত বিশাল এক দিঘী। গড়ের সামনে দুই দিকে দুইটি সাইনবোর্ড, একটিতে ভিতরগড়ের মানচিত্র, অন্যটিতে গড়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ঐতিহাসিকদের মতে, প্রায় বারো বর্গমাইল এলাকাজুড়ে এ গড় ও নগরী নির্মাণ করেন প্রাচীন কামরূপের শূদ্রবংশীয় রাজা দেবেশের বংশজাত পৃথু রাজা। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় পৃথু রাজার অভ্যুদয় ঘটে। তিনি কামরূপে পরাজিত হয়ে ভিতরগড় এলাকায় গমন করেন এবং নির্মাণ করেন এই গড়। চারটি প্রতিরক্ষা দুর্গ

দিয়ে এর প্রতিরক্ষা বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছিল। সাথে ছিল পরিখা। এ ছাড়া ছিল ছোট বড় প্রায় দশটি দিঘী।

বলা হয়, কিচক জাতির আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মহারাজা পৃথু নাকি তার পরিবার পরিজন নিয়ে একান্ন একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত এই দিঘীতে আত্মহত্যা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের কারণে এ দুর্গনগরীর কিছু অংশ ভারতের মধ্যে পড়েছে এবং সময়ের আবর্তনে প্রায় হাজার বছরের পুরানো এই দুর্গনগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের জন্য এই নগরী সম্ভবত বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মানচিত্র থেকে জানা গেল, সম্পূর্ণ গড় এখনো খনন করা হয়নি। মনে পড়ে গেল, চায়ের বাগান থেকে ফেরার পথে একজায়গায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নীলরঙা

সাইনবোর্ড দেখে অটো থেকে নেমে পাশের চায়ের দোকানে বসে থাকা এক বৃদ্ধের সাথে কথা বলেছিলাম। তিনি একটি মসজিদ দেখিয়ে বলেছিলেন, ওটা নাকি আর্কেওলজিক্যাল সাইট। পায়ের নিচের ইট বিছানো রাস্তাও তার অংশ। কিন্তু প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ইতোমধ্যে সেখানে মসজিদ নির্মানের জন্য খোঁড়াখুঁড়ি হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তুপের চেয়ে আমাদের কাছে বেশি ভালো লাগলো দিঘীর পাশের গাছে ঝুলে থাকা কয়েকশ বাঁদুর।

তেঁতুলিয়ার ডাকবাংলো

তেঁতুলিয়ায় সরকারি ডাকবাংলো রয়েছে দুইটি। একটি নতুন, অন্যটি শতবর্ষের পুরানো। এশিয়ান হাইওয়ে থেকে একটু ভিতরে মহানন্দা নদীর একদম তীর ঘেষে পুরাতন ডাকবাংলো। এ অঞ্চলে মহানন্দা নদীই বাংলাদেশ আর ভারতকে বিভক্ত করেছে। নদী গিয়েছে এঁকে বেঁকে, সীমানাও তেমনি। নদীর এ পাড়ে সাদা রঙের সীমানা ফলক। ধারণা করি, নদীর ও পারে রয়েছে ভারতের সীমানা ফলক, মাঝখানে নদীটা নো ম্যান্স ল্যান্ড।

ডাকবাংলো কিছুটা উঁচু জমির উপরে নির্মিত। সম্ভবত, মাটি ফেলে উঁচু করে তবেই নির্মান করা হয়েছিল দেড়তলা উচ্চতার ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের ডাকবাংলোটি। এই ডাকবাংলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। বহু রথী মহারথী এখানে রাত কাটিয়েছেন। এছাড়া এর আশেপাশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্যও এই বাংলো সুপরিচিত। পরিষ্কার আবহাওয়ায় দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। নদীর সৌন্দর্য তো আছেই।

নতুন বাংলোটি কাছেই, আধুনিক নির্মাণশৈলী সেখানে স্পষ্ট। পুরাতন ডাকবাংলোর সকল সুবিধা পাওয়া যাবে না এই বাংলোতে। হয়তো আধুনিক কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে যা নেই পুরাতন বাংলোতে। আমরা এসেছি

পুরাতনের লোভে, বাংলোর সীমানায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকার এই সুযোগ নতুন বাংলোতে নেই বলে বেশ তৃপ্তি বোধ হচ্ছিল।

কেয়ারটেকার দুপুরের ভাত খেতে বসেছিল। বাংলোর পাশেই আলাদা সীমানার মধ্যে তার বাসা। শোয়াইবের ডাকে মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বের হয়ে চাবি দিয়ে অনুরোধ করলো নিজেরাই যেন খুলে নেই। জানালো, করতোয়া ২ নামের কক্ষটি আমাদের জন্য বরাদ্দ, সব কিছু গোছানোই আছে।

বাংলোটা পুবদিকমুখী। সীমানার বাহিরে ঢালু জমিতে কিছু ঝোপঝাড় হয়ে আছে। একটু দূরে ধানের ক্ষেত। এই ভরদুপুরে জায়গাটা বেশ নির্জন। এমনিতে ডাকবাংলো খোলা জায়গা, যে কেউ সীমানায় প্রবেশ করে ঘুরে দেখতে পারে। ডাকবাংলোয় ঢুকতে গিয়ে খেয়াল করলাম বাংলোর সামনের দিকে সিড়িতে ঘনিষ্ঠ হয়ে একজন পুরুষ এবং একজন বোরকা পড়া নারী বসে আছেন। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে দুজনেই উঠে গেল। মেয়েটার মুখ ঢাকা, ছেলেটার বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে বলে মনে হল।

বাংলোতে রুম সব মিলিয়ে মাত্র তিনটি। দুটি রুমে দুটি করে বেড, অন্যটি সভাকক্ষ। ঘরে ঢুকেই লম্বা করে সালাম দিলাম - 'আসসালামু আলাইকুম', কেউ উত্তর দিল না। অবশ্য উত্তর দিলে সহ্য করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

বাংলোটা শত বছরের পুরানো হলেও নিয়মিত সংস্কার করা হয়েছে সম্ভবত। রুমের সাথেই এটাচড টয়লেট। আকৃতি রুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই যথেষ্ট বড় রাখা হয়েছে। কমোড রয়েছে, গরম পানির ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে একই সাথে পানির কলে সমস্যাও রয়েছে। সবসময়েই কল দিয়ে ক্ষীণ ধারায় পানি পড়ছে।

রুমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ছাদের উচ্চতা। কম করে হলেও আঠারো ফুট উঁচু ছাদ। এসি আছে, ফ্যানও আছে। ফায়ারপ্লেস আছে, তবে এটি ব্যবহার করা হয় বলে মনে হল না। বিছানাগুলো খুবই আরামদায়ক। টেলিভিশনে বহু সংখ্যক বিদেশি চ্যানেল। সব মিলিয়ে আমাদের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি।

মাল সামাল রেখে হাত মুখ ধুয়ে আধা ঘন্টা পরে বের হয়ে দেখি যে ভ্যানরিকশায় এসেছি সে তখনো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। আকৃতিতে ছোটখাটো মধ্যবয়সী লোকটা বাস থেকে নামার সাথে সাথেই আমাদের টার্গেট করেছে। প্রথমেই জানতে চেয়েছে ডাকবাংলোতে যাবো কিনা। ভ্যানে উঠে বসার পর সে বলেছে এই এলাকায় দেখার অনেক কিছু আছে। মোট পাঁচটা স্পট। চাইলে ঘুরিয়ে আনবে। কি কি স্পট তাও বলল। দূরের স্পট যেমন বাংলাবান্ধা বা পাতির বাগানে গেলে যে বেশি টাকা লাগবে তাও বলল। কিন্তু যখন জানতে চাইলাম পাঁচটা স্পট ঘুরিয়ে আনতে তাকে কত টাকা দিতে হবে তখন আর সে স্পষ্ট করে কিছু বলে না। কয়েকবারের প্রশ্নে সে বলল, দুইদিন আগে দুইজনকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে তারা সাতশ টাকা দিয়েছিল। বুঝলাম পর্যটক জবাইয়ে সে সিদ্ধহস্ত, সুতরাং তাকে কাটানোই উত্তম হবে।

বাংলোতে বা আশেপাশে খাবারের ব্যবস্থা নেই। তেঁতুলিয়ার বাজারে হোটেল আছে, সেখানে যেতে হবে। যেহেতু আর কোন ভ্যান নেই, তাই উঠলাম আগের ভ্যানেই। ভ্যানচালক জানালেন, এই এলাকার ভালো

হোটেল হল বাংলা হোটেল এবং তারপর সে শাপলা হোটেলকে পাশ কাটিয়ে, বাংলা হোটেলের প্রথম শাখার সামনে দিয়ে কিছুটা ভিতরে গিয়ে বাংলা হোটেলের দ্বিতীয় শাখায় নিয়ে গেল। কমিশন পায়?

আমি যে খুব খাদ্যরসিক তা নয়, তবে খাবার নিয়ে এক্সেপেরিমেন্ট করতে বেশ ভালো লাগে। বিশেষ করে নতুন যে কোন খাবার অন্ততপক্ষে স্বাদ নেয়ার ব্যাপারে আমি বেশ আগ্রহী। বাংলা হোটেলের স্পেশাল আইটেম হল কয়েকপদের ভর্তা - বেগুন, ধনিয়াপাতা, আলু এবং ডাল। সামান্য পরিমাণ, কিন্তু একজনের জন্য যথেষ্ট। তরকারি হিসেবে পাওয়া গেল গরু, খাসি, মুরগি এবং মাছ। মাছের নাম জোয়ারি মাছ। আকারে সাত আট ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় নলা মাছের মত। এই মাছের নাম শুনি নাই। শোয়াইব নাকি এমন কোন মাছ নেই যা খায় না। কিন্তু এই মাছের নামও সে জানে না। মাছ ভালো করে ভেজে ভুনা করা হয়েছে। এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে আমি এক পিস নিলাম, শোয়াইব সেখান থেকে একটু খেয়ে তার অর্ডার মুরগি পালটে মাছ নিল। বেশ সুস্বাদু এক মাছ। ভালো করে ভেজে নেয়ার কারণে খেতে আরও ভালো লাগলো।

খাবার শেষ করে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন সেই যুবক-যুবতীকে আবারও দেখতে পেলাম। পাশাপাশি বসে খাবারের অপেক্ষায় আছে। চোখাচোখি হয়ে গেল একবার।

ভ্যানচালক বসেই ছিলেন। হোটেলের ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তেঁতুলিয়ায় দেখার কি রয়েছে। উত্তরে ক্যাশিয়ারও ভ্যানচালককে দেখিয়ে দেয়ায় আমাদের ধারণা সঠিক বলেই মনে হল। অথচ আমরা বুঝে গিয়েছি এই ভ্যানচালকের সাথে ঘুরতে গেলে পকেট ফাঁকা হয়ে যাবে। তাই ভ্যানচালককে এড়িয়ে আমরা সামনের দিকে গেলাম।

তেঁতুলিয়ার বর্ণনা দেই। জেলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী তেঁতুলিয়া বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা যার আয়তন ১৮ বর্গকিলোমিটার। দুজনে মিলে চারপাশ ঘুরে যা দেখেছি সে অনুযায়ী বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তেঁতুলিয়া বাসস্টপেজের গোড়ায় তেঁতুল গাছের কথা। বেশ পুরানো পাশাপাশি তিনটি গাছের গোড়া একত্রে

বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। এই গাছের কারণেই এর নাম তেঁতুলিয়া কিনা তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। বাসস্টপেজ এবং আশেপাশের অনেকটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে তেঁতুলিয়া বাজার। এই বাজারটি নতুন। পুরাতন বাজার ছিল মহানন্দার একদম তীরে, ডাকবাংলোর সড়কে। বর্তমানে পরিত্যক্ত বাজারটি ঘুরে দেখেছি আমরা। অবকাঠামোগত দিক থেকে বর্তমান বাজারের তুলনায় উন্নত হলেও আকৃতিতে বেশ ছোট। কি কারণে বাজারের স্থান পরিবর্তন হল তা স্থানীয় দুয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা গেল না।

তেঁতুলিয়ার বাজার যে কতটা জমজমাট সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি সন্ধ্যার পর। দুপুরে পেট ভরে খাওয়ার পর মালাইভর্তি অতিমিষ্টি এককাপ চা খাওয়ার পর বাজারের ভেতরে এ পথ সে পথ ঘুরে ভ্যানচালকের চোখ এড়িয়ে আমরা তেঁতুলিয়া ঘুরতে বের হলাম।

আমাদের মত পর্যটকদের দেখার জন্য উল্লেখযোগ্য খুব বেশি কিছু তেঁতুলিয়ায় নেই। স্থানীয়রা বলে এখানে এক বাড়িতে আছে বোম্বাই বাঁশ যার বৈশিষ্ট্য হল এর প্রস্থ। বেশ চওড়া বাঁশ, গোড়ার দিকে ঘের বারো চৌদ্দ ইঞ্চি হবে। এরকম চওড়া প্রস্থের বাঁশ দেখেছিলাম মহেশখালীতে। ওই এলাকায় অবশ্য এই বাঁশ মোটেও দর্শনীয় বস্তু নয়। তেঁতুলিয়ায় আরেক ধরনের বাঁশের কথা সবাই বলে - হলুদ বাঁশ। ছোট আকৃতির কিছু চা বাগান রয়েছে। আছে মহানন্দা নদী, ডাকবাংলো আর পার্ক।

পুরাতন বাজারের কাছে নদীর ঠিক ওপারে ভারতের অংশে একটি ব্রেইলি সেতু আছে। তার আশেপাশে রয়েছে বিএসএফের কিছু চৌকি। ভালো করে লক্ষ্য করলে দুয়েকজন টহলরত জওয়ানকেও দেখা যায়। বিএসএফ-কে দেখলে এখন আর শিহরণ জাগে না। প্রথম যখন নেত্রকোনা সীমান্তে গিয়েছিলাম তখন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কেমন যেন অজানা আশংকায় পেয়ে বসেছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি একটা বুলেট এসে এঁফোড় ওফোঁড় করে দেবে। এই ভয় যে অমূলক তা বুঝতে সময় লেগেছে। বিএসএফ যে অকারণে গুলি করে মারে না এবং বিজিবিও যে মাঝে মাঝে কিছু মানুষ মারে তা জানার পর এই শংকা কেটে গেছে। ২০১২ সালে তিনবিঘা করিডোর পার হয়ে আঙ্গরপোতা দহগ্রাম ছিটমহলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এক হাত দুরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা বিজিবির জওয়ানদের দেখে বুঝতে পেরেছিলাম এরা আমাদের মতই মানুষ, নিজ সরকারের আজ্ঞাবাহক।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের যে সীমান্ত এলাকাতেই গিয়েছি, একমাত্র মেহেরপুর ছাড়া আর বাকী সব সীমান্তেই কেউ না কেউ আমাদের বলেছে - 'ভুলে ভারতের বর্ডারে চলে যেয়েন না যেন'! এই ধরণের সতর্কবার্তা খুবই বিভ্রান্তিকর। সীমান্ত সম্পর্কে বিশেষ করে বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা আছে। এই ধরণের ভুল করে ফেলবো এতটা বেভুল কখনো ছিলাম না কিন্তু এই তেঁতুলিয়াতেও আমরা যখন একটি আমবাগান দেখা শেষ করে মাটির রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি তখন একটি প্রাইভেট কার এসে থামল, জানালার কাঁচ নামিয়ে কোথা থেকে এসেছি, কার বাড়ীতে এসেছি, এখানে কোথায় এসেছি ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইল। আমাদের যথাযথ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে প্রশ্নকর্তা বিদায় নেয়ার সময় বলে গেল - 'দেইখেন ভারতের বর্ডারে চলে যাইয়েন না যেন'!

ব্যাস! শুরু হয়ে গেল আমাদের পালপিটিশন। রাস্তা ধরে এগুলে আমরা আবার সেই তেঁতুলিয়া বাজারেই পৌঁছুবো জানি, ভারতের সীমানা ঐ দূরের নদীরও ওপারে সেও জানি, কিন্তু গাড়িওয়ালার সতর্কবার্তা উপেক্ষাও করতে পারছি না। আশে পাশে একটিও মানুষ নেই যার কাছ থেকে জেনে নেয়া যায় ভারত সীমান্ত কতদূর। শংকাচিত্তে পথ চলতে চলতে এক সুদর্শন যুবকের দেখা পাওয়া গেল, তাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি নির্দেশনা দিয়ে বললেন 'আশে পাশে এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ভারত সীমান্ত নেই, নিশ্চিন্তে এগিয়ে যান', আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মহানন্দা নদী। এপাড়ে বাংলাদেশে দাড়িয়ে আমি, ওপারে ভারত। মাঝের নদীতে যারা তারা বাংলাদেশী।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা যখন পুরাতন বাজার এলাকায় পৌছুলাম তখন চারটা পেরিয়ে গেছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাজারের পাশেই মহানন্দা নদী। নদীর তীরে উঁচু বাঁধ, তীরে বসার ব্যবস্থা আছে। বাঁধের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নদীতে নামার ব্যবস্থাও আছে। এখন শীতকাল বলে প্রায় পুরো নদীটাই পানিশূণ্য। নদীর সম্পূর্ণ প্রস্থের তিন ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে গোড়ালি বা হাঁটু সমান পানি বয়ে চলছে। নদীতে বহু সংখ্যক পুরুষ, সাথে অল্প কিছু নারী, পাথর তোলার কাজে ব্যস্ত। এক মুরুব্বি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম বাঁধের ঠিক নিচেই যে সাদা পিলার দেখা যাচ্ছে ওটাই সীমানা নির্ধারক, এ পাড়ে বাংলাদেশ, ও পাড়ে ভারত। নদীতে যারা কাজ করছে তারা সবাইই বাংলাদেশি এবং আমরা চাইলে নির্ভয়ে যেতে পারি।

শোয়াইব ঠিক এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সূর্যাস্ত সে ভালোভাবে উপভোগ করতে চায়। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নয়, সরাসরি এবং নদীর পানিতে এর প্রতিচ্ছায়াসহ। সুতরাং আমরা নেমে গেলাম।

মহানন্দার পাথর কোয়ারি

মহানন্দা নদীর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ। এরকম স্বচ্ছ পানি আর পেয়েছিলাম নেত্রকোনায় সোমেশ্বরী নদীতে। সেটাও ভারত সীমান্তে। পানি স্বচ্ছ হবার মূল কারণ সম্ভবত এর নিচে মাটির পরিবর্তে বালু এবং পাথরের অবস্থান। বর্ষায় সম্পূর্ণ নদী ভরে যায়। নদীর পাড়ে স্থাপিত সীমানা পিলারগুলো তখন পানির নিচে তলিয়ে যায়। এ কারণে প্রত্যেক পিলারের মাথায় আবার একটি করে সাদা প্লাস্টিকের পাইপ লাগানো রয়েছে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদীতে পাথর উত্তোলনরত শ্রমিকদের কাছে গেলাম। কয়েকজন পাথর তুলে আনছে, বাকীরা সেগুলা ঝুড়িতে তুলে নিয়ে মাথায় বা বাখারীর দুইপ্রান্তে ঝুলিয়ে তীরে এনে ফেলছে। একটি নির্দিষ্ট এলাকা ঘিরে আট দশজন কাজ করছে। যারা পাথর তুলছে তাদের হাতে পঁচিশ ত্রিশ ফুট উঁচু বাঁশ, মাথাত ছাঁকুনিসহ বিশেষ ধরণের আঁকড়া লাগানো। যে জায়গাটি ঘেড়াও করে তারা দাঁড়িয়ে আছে তার ব্যাস প্রায় ত্রিশ ফুট হবে। পানির মধ্যে যখন আঁকড়া লাগানো বাঁশ ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে তার পুরোটাই হারিয়ে যাচ্ছে পানির তলায়। তারপর ধীরে ধীরে টেনে তুললে পাওয়া যাচ্ছে নুড়ি থেকে শুরু করে মাঝারি আকৃতির এক ঝাঁক পাথর। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে কাজ করলেও এক হাত দূর থেকেই পাথর তুলে গভীর করা হয়েছে এবং জায়গাভেদে এই গভীরতা তিন চার মানুষও হতে পারে।

কি ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে লোকগুলা কাজ করছে বুঝতে পেরে বুকের ভেতরে ঠান্ডা হয়ে গেল। শোয়াইব মনে করিয়ে দিল কিছুদিন আগেই সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায় লোভাছড়া নদীর তীরে ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনার কথা। ছয় সাতটি শিশু নেমেছে পাথর তোলার জন্য এবং তাদের মধ্যে তার ছেলেও আছে এ কথা জানতে

পেরে সুন্দর আলী ছুটে গিয়েছিলেন তাদেরকে নিবৃত্ত করার জন্যে। বাবাকে ছুটে আসতে দেখে ছেলে পালিয়ে গেল। সুন্দর আলী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বাকি বাচ্চাদের ধমকাচ্ছিলেন উঠে আসার জন্য। ঠিক সেই মুহুর্তেই পাড় ভেঙ্গে সুন্দর আলীসহ ছেলেরা তলিয়ে গেলেন মাটির নিচে, একত্রে ছয়জন মানুষ মৃত্যুবরণ করল যাদের মধ্যে পাঁচজনই কিশোর, বয়স এগারো থেকে পনেরোর মধ্যে।

ডেইলি স্টার পত্রিকা থেকে সংগৃহীত এই ছবিটি তুলেছেন শেখ নাসির। সুন্দর আলীসহ ছয়জন তলিয়ে যাওয়ার পরে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

'এই যে পাথর তুলছেন এটা কি আপনারাই বিক্রি করেন নাকি এর জন্য মজুরী পাবেন?' - কাজ শেষ করে উঠে আসা লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো শোয়াইব।

'নিজেরাই। মানুষ মাছ ধরে, আমরা পাথর তুলি' - জবাব দিল একজন।

'সারাদিনে কতটুকু পাথর তুলতে পারেন?'

'দুই লরি হয়। আজকে একটু কম হবে।'

'কতক্ষণ কাজ করেন?'

'নয়টায় আসছি। এখন যাবো।'

শোয়াইব ঘড়ি দেখল। পাঁচটা বেজেছে। অর্থ্যাৎ আট ঘন্টা। 'এক লরি পাথরের দাম কত?'

'বিয়াল্লিশশ'।

'কতজন কাজ করেন?'

'আমরা আটজন'।

আটজনে আটঘন্টা কাজ করে দু লরি পাথর বিক্রি করে আটহাজার চারশ টাকায়, মানে জনপ্রতি দিনে একহাজার টাকা। কিন্তু এই কাজ অত্যধিক পরিশ্রমের, ফলে এরা খুব দ্রুতই অসুস্থ্য হওয়ার কথা। তার উপর এই কাজ সিজনাল, পানি বেড়ে গেলে তারা নিশ্চয়ই এই কাজ করতে পারে না।

দূরে নদীর বালুচরের উপর দিয়ে তিনজন তরুণী খালিপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। স্পষ্ট বোঝা যায় তারা এলাকাটি ভালো চিনে। আমরা দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে ডুবন্ত সূর্যকে পিছনে রেখে তীরে অন্ধকারে ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম।

তেঁতুলিয়ার বাজারে

শীতকালে সন্ধ্যা নামে তাড়াতাড়ি। অবশ্য আমার মত ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যাপারটা নেতিবাচক নয়। দিনের আলোতে যা দেখা যায় রাতের বেলা তার কম দেখা যায় না। পার্থক্য হল দিনের বেলা সকলে দর্শনীয় স্থান/বস্তু দেখে, রাতে দেখতে হয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। আর এই জিনিস দেখতে হলে যেতে হয় বাজারে। ডাকবাংলোয় ফ্রেশ হয়ে আমরা আবার গেলাম তেঁতুলিয়া বাজারে।

আগেই বলেছি, রাতের তেঁতুলিয়া বাজার খুব সরগরম। এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাটি করে তবেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। মনে হল গ্রামের সকল পুরুষই বোধহয় এখানে চলে এসেছে। ছোট বড় অসংখ্যা জটলা। মাছওলার সামনে ভীড়, তরকারীওলার সামনে ভীড়। চায়ের দোকানে ভীড়, পিঠার দোকানেও ভীড়। ধারনা করলাম, সারাদিনে যে যেখানেই কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন সন্ধ্যার পর বোধহয় সবাই বাজারে উপস্থিত হয়। নিত্য কেনাকাটা তো থাকেই, এমনি দেখা সাক্ষাতও হয়ে যায়।

তেঁতুলিয়া বাজারের তেঁতুল গাছ

বাংলা হোটেলের গলিতে ঢুকে দেখি এখানে ভীড় সবচেয়ে বেশি। দুপুরে ভাত খেয়ে বের হবার পর এক দোকানে জিজ্ঞেস করেছিলাম - এখানকার সবচেয়ে ভালো চা বানায় কোথায়। উত্তরে দোকানদার ছেলেটা রঙ চায়ের জন্য যে দোকানটি দেখিয়ে দিয়েছিল সেখানে কাস্টমার দূরের কথা, চা-ওলা নিজেই উপস্থিত ছিল না। আর এই সন্ধ্যায় এসে দেখলাম সেই দোকানে এত ভীড় যে দোকানটাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভীড় ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখলাম শুধু চা নয়, ভাজাভুজির বেশ কিছু আইটেম হটকেকের মত চলছে। তিনজনে মিলে বানাচ্ছে, পরিবেশন করছে, হিসাব করছে এবং টাকা নিচ্ছে। দোকানের চারদিকে কাস্টমার দাঁড়িয়ে। একেকবারে আট দশ কাপ চা তৈরি হচ্ছে। আদা-লেবু-মাল্টা-ধনিয়া পাতা একত্রে মিশিয়ে তারপর চা পাতা-চিনি দিয়ে তৈরি হচ্ছে চা। স্বাদ কিরকম হল তা বলতে পারছি না। ডাকবাংলোর কাছেই স্টল থেকে দশ টাকায় ভেন্ডিং মেশিনের কুৎসিত দুধ চা খেয়ে এসেছি, আরেকটি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না।

চা তৈরির মতই চমৎকার ভাজাভুজির অংশ। বড় কড়াইয়ে ফুটন্ত তেল। পাশে বেসন মাখানো বড় গামলা। ব্যাচ অনুযায়ী ভাজার জন্য বিভিন্ন রকম উপকরণ। আমরা যখন গিয়েছি তখন রসুন ভাজা হল মাত্র। মাঝারী আকৃতির রসুনের খোসা ছিলে রাখা হয়েছিল। বেসনে ডুবিয়ে গরমম তেলে ভেজে রাখার কয়েকমিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। রসুন ভাজা এই অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। এই জিনিস আগেও খেয়েছিলাম, শোয়াইব এই প্রথম খেয়ে দেখল। উপাদেয় জিনিস।

রসুনের পর ছাড়া হল ডালের বড়া। পেঁয়াজ ছিল না বা খুবই কম ছিল বলে পেঁয়াজু বললাম না। ছোট ছোট করে একেকেটা বড়া ছাড়া হচ্ছিল তেলের মধ্যে। দেখতে দেখতে কড়াই ভর্তি হয়ে তেলের উপরে ভাজা বড়ারও উপরে জমা হতে লাগল। বুঝতে পারছিলাম না, তেলে ভাজা বড়া যদি তেলের ছোঁয়াই না পায় তাহলে ভাজা হবে কিভাবে। মোটামুটি শ দেড়েক বড়া ছাড়ার পর ক্ষান্ত দিলেন রাঁধুনি লোকটা। তারপর দেখি বড় আকারের চামচ দিয়ে একসাথে সম্পূর্ণ চাকটাই উলটে দেয়া হল। আর এভাবেই একদম উপরের বড়াগুলো যারা তেলের স্পর্শই পায়নি তারা চলে গেল তেলের একদম গভীরে।

ডালের বড়ার পর চলল কাঁচামরিচের বড়া ভাজার প্রস্তুতি। এই আইটেম বেশি লোক খায় না। তাই মাত্র ডজনখানেক ভাজা হল। তারপর বেগুনি। তারপর ধনেপাতার বড়া। তারপর আবারও রসুনের বড়া। আমরা পছন্দমত খেয়ে দেখলাম। দাম সস্তা, দুজনের সব মিলিয়ে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা বিল হল।

তেঁতুলিয়ায় প্রায় সবকিছুর দামই কম। দুঁধ চায়ের দাম মাত্র পাঁচ টাকা। সবজির দামও কম। অনেক দুরত্ব পার হয়ে যাওয়া যায় খুব সামান্য টাকায়। গরুর কেজি চারশ আশি টাকা। ব্রয়লার মুর্গি একশ দশ টাকা। খাসি মুরগী কেটে কুটে পিস করে বিক্রি করে, কেজি একশ আশি টাকা। একমাত্র মাছের দাম শুনে কোন পার্থক্য পাওয়া গেল না, বরঞ্চ একটু বেশিই মনে হল।

পঞ্চগড় তেঁতুলিয়া রুটে চলাচলকারী বাস মিনিবাস ট্রাক চালক সমিতির নির্বাচন সামনে। পোস্টার ফেস্টুনে ভরে গেছে বাজার। কয়েকটা নির্বাচনী ক্যাম্প চোখে পড়ল। একজন প্রার্থী ড্রাইভার কেঁচি মার্কা হাতে কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বাজারের এ মাথা ও মাথা মিছিল করে গেল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল আফসার আলী ভাইয়ের মার্কা। কত শত নিরীহ মার্কা থাকতে তাকে কেন

পিস্তল মার্কা দেয়া হল তা বোঝা গেল না। মার্কার ক্ষোভেই কিনা জানি না, আফসার আলী ভাই প্রচারণা করেননি বললেই চলে। পঞ্চগড় থেকে শুরু করে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত তার পোস্টার চোখে পড়েছে মাত্র গোটা ছয়েক।

বাজারে ঘুরতে ঘুরতেই ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা ঘটল। শোয়াইবের মোবাইল ফোনের সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেল। রিস্টার্ট করা যায়, কিন্তু চালু আর হয় না। সাংবাদিকের ফোন নষ্ট হয়ে গেলে টেনশন।

এই ধরনের মফস্বল এলাকার হোটেলে রাতে খুব বেশি খদ্দের হয় না। তাই, রাতের জন্য আলাদা কোন আয়োজন হয় না, দুপুরের রান্নাই রাতে পরিবেশন করা হয়। এ কারণে কোনমতে রাতের খাবার শেষ করে বেরিয়ে যেই না এক ভ্যানওলাকে দাঁড় করিয়েছি, দেখি সেই লোক যাকে দুপুরবেলা এড়িয়ে পালিয়েছিলাম।

ভ্রমণের প্রথম দিন শেষ হল ডাকবাংলোর পাশে অন্ধকারের বেঞ্চিতে বসে আকাশের সুপারমুন উপভোগ করে। দূরে ভারতের সীমানায় ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলো চাঁদের আলোকে ম্লান করতে পারেনি। রাত প্রচন্ড নিস্তব্ধ, কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়। সারাদিনের ঘোরাঘুরির তুলনায় তেমন একটা ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল না। কিন্তু আমরা শুয়ে পড়লাম এগারোটার আগেই। আগামীকাল সকালে উঠে বেরিয়ে পড়বো বাংলাবান্ধার উদ্দেশ্যে, তারপর যাবো কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেটে। সেখান থেকে সম্ভব হলে বোদায়। নাহয় ঢাকার বাসে উঠে পড়বো সন্ধ্যায়ই। পরেরদিন সকাল দশটায় নতুন চাকরীতে রিপোর্টিং করতে হবে, তাই দেরী করার উপায় নেই।

লেপের ভেতরে শুয়ে চোখ বন্ধ করার আগে টের পেলাম কেয়ারটেকার ডাকবাংলোর সদর দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

ডাকবাংলোর গভীর রাত

'নাজমুল ভাই... ', অনেক দূর থেকে কেউ যেন আমার নাম ধরে ডাকছিল, আমি একবার 'হু' বলে সাড়াও দিলাম। কিন্তু আবারও নাম ধরে ডাকল। এবার গলার স্বর বেশ পরিচিত মনে হল। আরেকবার ডাকতেই চিনতে পারলাম, শোয়াইব। জেগে উঠলাম। ঘর অন্ধকার। বাস্তবেই ডাকছে শোয়াইব।

'কি ব্যাপার শোয়াইব?'

'কিছু শুনতে পাচ্ছেন?'

'কি?'

'খেয়াল করে শুনেন। মনে হচ্ছে কেউ কাঁদছে।'

আমি কান খাড়া করলাম। কিছু শোনা গেল না। শোয়াইবকে বলার জন্য মুখ খুলতেই শব্দটা শুনতে পেলাম। চিকন সুরে কাঁদছে কেউ।

'শুনতেছেন?'

'হুম।'

কান্নাটা কোন নারীকণ্ঠের। শিশুও হতে পারে। কিন্তু এই ডাকবাংলোতে তো আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।
'ভুল হচ্ছে শোয়াইব। শব্দটা কান্নার মত মনে হলেও কান্না না। অন্য কিছুর শব্দ এটা।'
'কান্নাই তো মনে হচ্ছে।'
'এখানে কান্না করার লোক আসবে কোত্থেকে? আমরা ছাড়া আর কেউ নাই বাংলোতে। কেয়ারটেকারের বাসা থেকে এতদূর শব্দ আসবে না।'
'বাহিরে কেউ আছে?'
'দেখে নিলেই হয়'। আমাকে উঠতে দেখে শোয়াইবও উঠল।

লাইটের সুইচ রুমের দরজার সাথেই। উঠে গিয়ে বাতি জ্বালালাম। তারপর দরজার ছিটকিনিতে হাত রাখলাম। শোয়াইব পেছনে এসে দাঁড়ালো। কিছুটা অস্বস্তি যে বোধ করছি না তা নয়। দরজার ওপাশে কি দেখবো, সেটা ভৌতিক না লৌকিক কিংবা আদৌ কিছু দেখবো কিনা জানি না। ভয়ের কিছু নেই জানি। কিন্তু এর মধ্যে মনে পড়ে গেছে দুপুরের কথা। শোয়াইব বলেছিল, ঘরে কেউ না থাকলেও সালাম দেয়ার কথা। কার উদ্দেশ্যে সালাম দিতে হয়?

দরজা খুলে বের হলাম। করিডোরজুড়ে দুইটি একশ পাওয়ারের বালব জ্বলছে। বাহিরের উঠান আলোকিত করে রেখেছে আরও কিছু লাইট। সেই আলোতে এমন কিছু দেখা গেল না যার উপস্থিতি ভীতকর বা যা কান্নার শব্দ করতে পারে।

আমাদের রুম করতোয়া ২ একদম মাঝখানে। রুম থেকে বেরিয়ে ডানদিকে বাংলোতে ঢোকার পথ, বামদিকে করতোয়া ১ এবং তার পরে কমন টয়লেট। বাংলোর দরজায় তালা দেয়া। বাথরুমের দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই।

'পাশের রুমে কেউ কি আছে?'
'তালা দেয়া।'

তালাবদ্ধ দরজার এ পাশে দাঁড়িয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'কেউ আছেন?' - কোন উত্তর এলো না।

'কেউ নেই শোয়াইব। ভুল হচ্ছে আমাদের। বাতাসের শব্দ হতে পারে। অন্য কিছুও হতে পারে।'
'কেয়ারটেকারকে ফোন দিবেন?'
'নাম্বার তোমার কাছে।'
'ইস! তালা লাগাতে আসছিল যখন তখন নাম্বার নিয়ে রাখলে ভালো হত।'
'বাদ দাও। রাত তিনটা বাজে। কান্নার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।'

দশ মিনিট সময় অপেক্ষা করলাম আমরা। শোয়াইব টয়লেটে গেল। আমি কান পেতে অপেক্ষা করলাম শব্দটা আবারও শোনা যায় কিনা। তাহলে বোঝা যেত কোন উৎস থেকে শব্দটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে। কিছু শোনা গেল না। শুয়ে পড়লাম আমরা।

ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা

ডাকবাংলোর ঠিক পাশ দিয়ে মহানন্দা নদী বয়ে চলছে। ওপারে ভারত সীমান্তে চা বাগান, তার মাঝ দিয়ে রাস্তা। এই ডাকবাংলো থেকে ঐ দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এই কথা সবাই জানে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে পরিষ্কার দেখা যায়, এ কথা আগেই জেনেছিলাম। আমরা এসেছি ডিসেম্বরে, সুতরাং দেখতে পাবো এই আশা খুব বেশি করছি না। আশার ব্যাপার হল পঞ্চগড়ে যে পরিমান শীত পড়ছে বলে ধারণা করেছিলাম সেই তুলনায় শীত এবং কুয়াশা দুটোই কম। ফলে, সূর্য্যিমামা জাগার আগে আমরা উঠেছি জেগে, উদ্দেশ্য সূর্যোদয় তো দেখবই, কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখবো।

আলো ফুটে গেছে চারদিকেই। কিন্তু সূর্য উঠি উঠি করছে। আমরা ডাকবাংলোর কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে টুকটাক কথা বলতে বলতে সূর্যোদয় দেখতে লাগলাম। চা বাগানের উপর কুয়াশার চাদর বিছিয়ে রয়েছে। দেখতে বেশ চমৎকার লাগছে। সূর্য্য উঠেছে, কিন্তু তার আলো গায়ে এসে পড়েনি। সূর্য্যটাও কেমন নিষ্প্রভ লাগছে। কিন্তু কোথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা?

দুর্বল ক্যামেরায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ধরা যায় নি, খালি চোখে আমরা যে খুব ভালো দেখেছিলাম, তাও নয়!

ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার সকাল ছটার দিকে এসে সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে বালবগুলো নিভিয়ে দিয়েছিল। আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন আবারও দেখা গেল তাকে। আমাদের পাশেই এসে দাঁড়ালো। শোয়াইবের প্রশ্নের উত্তরে জানালো - ওই যে দূরে এক টুকরো মেঘ জ্বলজ্বল করছে, ওটাই কাঞ্চনজঙ্ঘা। আরেকটু পরিষ্কার হলে ভালো করে বোঝা যাবে। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে মিলিয়েও যাবে।

শোয়াইব প্রায় পৌনে একঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার চেষ্টা করলো। অথবা সে হয়তো গতকাল রাতের ঘটনাবলী চিন্তা করছিল। অথবা অন্য কিছু। আমি একা একা ঘুরে বেড়ালাম। ডাকবাংলোর পাশেই

তেঁতুলিয়া পার্ক ও পিকনিক স্পট। সেখানে কিছু দোলনা, স্লিপার ইত্যাদি রয়েছে। বসার জন্য ছাতাসহ টেবিল রয়েছে। পার্কের দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেট রয়েছে। বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু জন্তু জানোয়ারের ভাস্কর্যও রয়েছে। একটা বিশাল পঙ্খিরাজ ঘোড়া উড়তে শুরু করেছে, তার পাখাগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু পেছনের পা দুটো তখনো মাটি ছেড়ে যায় নি। আমি তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে পার্কে ব্যায়ামরত কিছু বয়স্ক নারী পুরুষদের লক্ষ্য করলাম। ফিরে এসে দেখলাম শোয়াইব আগের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে। তাকে ডেকে তৈরি হতে বললাম।

গন্তব্য বাংলাবান্ধা

কেয়ারটেকারের কাছে রুমের ভাড়া পরিশোধ করে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে আমরা যখন পথে নামলাম তখন আটটা বেজে গেছে। ডাকবাংলো থেকে বাংলাবান্ধার দূরত্ব প্রায় পনেরো কিলোমিটার। প্রথমে ভেবেছিলাম, একটা ভ্যানরিকশা ভাড়া করে চলে যাবো। এখানে সকল ভ্যানই ব্যাটারীচালিত ইঞ্জিনে চলে। রাস্তাও বেশ মসৃণ। ফলে পনের কিলো যেতে আধা ঘন্টার মত সময় লাগলেও চারদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। কিন্তু বাতাস আর ঠান্ডার কথা ভেবে এই চিন্তা বাদ দিতে হল। বাস আসতেই উঠে পড়লাম।

বাংলাবান্ধা বাংলাদেশের সর্বউত্তরের সীমানা। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলাশহর বাংলাবান্ধা থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে, শিলিগুড়ি শহর এগারো কিলো। স্থলবন্দর হিসেবে বাংলাবান্ধা অল্প কয়েকবছর আগে থেকে কাজ শুরু করেছে। ফলে এখনো ততটা জমজমাট নয়। এই বন্দর দিয়ে প্রচুর পরিমানে পাথর আমদানি করা হয়। বাংলাবান্ধার কয়েক কিলোমিটার আগে থেকেই রাস্তার দুই পাশে পাথর ভাঙ্গার কারখানা। তাতে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক কাজ করছে। আমরা যে বাসে উঠেছি তার বেশিরভাগ যাত্রীই পাথরভাঙ্গা কারখানার শ্রমিক। বাংলাবান্ধার আগে আগে বিভিন্ন স্টপেজে তারা নেমে যেতে লাগল। খেয়াল করে দেখলাম বেশিরভাগ শ্রমিকই নারী, পুরুষের তুলনায় অনুপাত ৮০:২০ হবে।

বাস থেকে নামার পর রাস্তা পরিচিত মনে হচ্ছিল। মনে পড়ে গেল, কিছুদিন আগেই শামসুজ্জামান আরাফাত নামের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাবেক শিক্ষার্থী বর্তমানে একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা এই রাস্তা দিয়ে দৌড়েছিল, ফেসবুক লাইভে তার ভিডিও দেখেছিলাম। আরাফাত দৌড় শুরু করেছিল বাংলাদেশের অন্যপ্রান্ত সেই টেকনাফ থেকে। সব মিলিয়ে বাইশদিন টানা দৌড়ে সে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কেউ এই রেকর্ড গড়ল। বিভিন্ন সূত্রে জেনেছিলাম, আরাফাতকে যমুনা নদীর উপরে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে দৌড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়নি, বাধ্য হয়ে আরাফাতকে সাঁতরে পাড়ি দিতে হয়েছিল যমুনা। দু:খজনক ব্যাপার হল আরাফাতের এই কাজ খুব একটা প্রচার পায়নি। প্রতিষ্ঠিত

মিডিয়াগুলোর বেশিরভাগই এর স্বীকৃতি দিয়ে কোন সংবাদ প্রকাশ করেনি। এটা অবশ্য আরাফাতের ব্যর্থতা নয়। আরাফাত তো মুসা ইব্রাহিম নন যে তার নিউজভ্যালু থাকবে।

বাংলাবান্ধা মোটেও দর্শনীয় জায়গা নয়। এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল এটি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জায়গা। তারপরও অনেক পর্যটক আসেন এই জায়গা দেখতে। তারা যেন স্মৃতি নিয়ে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে বছর কয়েক পূর্বে তৎকালীন ডিসি বনমালী ভৌমিক এখানে জিরোপয়েন্টের চিহ্নস্বরূপ বিশাল আকৃতির একটি শূন্য স্থাপন করেন।

ইচ্ছা ছিল বাংলাবান্ধায় এসে নাস্তা করবো। ধারণা ছিল না বলেই এই পরিকল্পনা। পৌছে দেখলাম এখানে হোটেল বলতে কিছু নেই। অল্প কিছু দোকান আছে যেগুলোয় বনরুটি-কলা-বিস্কুট-চা ইত্যাদি বিক্রি হয়। একটিমাত্র হোটেল পাওয়া গেল। সেখানে নাস্তা বলতে লুচি আর খিচুড়ি। খিচুড়ি রান্না করা হয়েছে শীতকালীন কিছু সবজি সহকারে। প্রয়োজনে ডিমভাজা পাওয়া যাবে। আমরা ছাড়াও আরও দুজন খদ্দের ছিল। বিল দেয়ার সময় দেখলাম তারা একশ টাকার দুটো ভারতীয় রূপি বের করে দিল, দোকানিও তা গ্রহণ করে নিল। বুঝলাম তারা ভারতীয় নাগরিক, সম্ভবত ট্রাক নিয়ে প্রবেশ করেছে। আর জানলাম, বর্ডার এলাকায় দুই দেশের মুদ্রাই চলে।

কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট

তেঁতুলিয়া বাজারে একবার নেমে চা খেয়ে আবার বাসে উঠে চলে গেলাম শালবাহান রোডে। সেখান থেকে আবার অটো নিয়ে শালবাহান বাজারে। বাজার থেকে সামান্য পিছু হটে ঘুরে গিয়ে নামলাম কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেটের দরজায়। এই চা বাগানের কথা বলেনি এমন মানুষ কমই পেয়েছি। পঞ্চগড়ের চা বাগান আকর্ষণ

করেনি, আগেই বলেছি, তারপরও এসেছি কারণ একজন বলেছেন বাগানের ভিতরে একটি রিসোর্ট আছে, খুবই নান্দনিক। যদিও সকলের প্রবেশের অনুমতি নেই, চেষ্টা ছাড়াই বিফল হওয়ার আগ্রহও নেই আমাদের। ফলে চলে এলাম।

বাগানে প্রবেশের জন্য কোনই অনুমতির প্রয়োজন নেই। দারোয়ানকে বলেই প্রবেশ করা যায়। ভেতরে ঢুকেই সবার প্রথমে যেটি চোখে পড়বে তা হল বিশাল সাইনবোর্ডে প্রায় শ'খানেক গাছের নাম। এই চা বাগানে এই গাছগুলো আছে। এরকম আরো একটি সাইনবোর্ড আছে ভেতরের দিকে।

কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট হল জেমকন গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। জেমকন গ্রুপের কর্ণধার দুই সহোদর কাজী শাহেদ এবং কাজী জাহেদের নাম অনুসারে কাজী এন্ড কাজী রাখা হয়েছে। ভেতরে চা বাগান ছাড়াও একটি রিসোর্ট আছে, চায়ের কারখানা আছে, গরুর খামার আছে। বিভিন্ন রকম চা তৈরির জন্য বিভিন্ন রকম পাতার বাগান যেমন তুলসী বাগান, জেসমিন বাগান, আদা বাগান, নার্সারি ইত্যাদি আছে। ২০০০ সালের দিকে পঞ্চগড়ে বাগান স্থাপনের উদ্যোগ নেয় জেমকন গ্রুপ। সে সময় এ অঞ্চলের জমি খুব অনুর্বর হয়ে গিয়েছিল। চাষাবাদের চেষ্টায় খুব সামান্য ফসল পাওয়া যেত। ফলে জেমকন গ্রুপসহ অন্যান্যরা যখন জমি কিনতে শুরু করল তখন পানির দামে জমি ছেড়ে দিল এ এলাকার মানুষ। শোনা গেল, প্রতি একর জমি দুই তিন হাজার টাকায়ও বিক্রি হয়েছে সেই সময়। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জেমকন গ্রুপ সেই সময় থেকে জমি কিনে চলেছে। জানলাম, এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি কিনেছে জেমকন গ্রুপ, তবে এর মধ্যে মাত্র দুই হাজার একর জমি বুঝে পেয়েছে সরকারি নিয়মনীতি পালন শেষে। বাকী জমির মালিকানা গ্রহন প্রক্রিয়া চলছে।

কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট বাংলদেশের একমাত্র অর্গানিক চা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান। এর মানে হল এই চা বাগানে কোন প্রকার রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করা হয় না। পঞ্চগড়ে ছোট বড় অনেক চা বাগান আছে। চা

উৎপাদনকারী অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজেদের চা বাগানের বাহিরেও অন্যান্য বাগানের পাতা ক্রয় করে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখে। অর্গানিক চায়ের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য কাজী এন্ড কাজী অন্য কারও চা পাতা গ্রহণ করে না, নিজেদের পাতা কারও কাছে বিক্রিও করে না।

আমরা যখন বাগানে প্রবেশ করেছি তখন কামীনেরা মাত্র চা পাতা তোলা শেষে বিশ্রামে বসেছে। গাছের ছায়ায় বসে তারা যখন বাড়ি থেকে নিয়ে আসা রুটি বা অন্য কিছু দিয়ে নাস্তা করে নিচ্ছে, আমরা তখন তাদের পাশ কাটিয়ে এক বিশাল বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছি। দরজার কাঠামো লোহার তৈরি হলেও বাকী অংশ বাশের বেড়া দিয়ে তৈরি। গেটম্যান জানালো এটিই রিসোর্টের প্রবেশপথ এবং বিশেষ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। অগত্যা দরজা থেকেই বিদায় নিতে হল, তবে শোয়াইব হালও ছাড়ল না।

শোয়াইবের কর্মস্থলে সামনের ডেস্কেই বসেন রত্না আপা। তার বাড়ি পঞ্চগড়ে। রত্না আপার এক কাজিন শাহিন ভাই আছেন কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেটে। তাকে বলে হয়তো রিসোর্টে ঢোকার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু শোয়াইবের মোবাইল নষ্ট হবার কারণে রত্না আপার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমার মোবাইল থেকে প্রথমে একে ওকে ফোন করে রত্না আপার নাম্বার পাওয়া গেল, রত্না আপা শাহিন ভাইকে ফোন করে বলে দিলেন এবং আমাদেরকেও শাহিন ভাইয়ের নাম্বার দিলেন। ততক্ষণে আমরা চা বাগান ঘুরে গরুর খামার এবং নার্সারি ঘুরে মিনি মিনা বাজার পাশ কাটিয়ে হাজির হয়েছি চা তৈরির কারখানার সামনে। কিন্তু সেখানেও প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। অবশেষে শাহিন ভাইয়ের কল্যাণে কারখানায় ঢোকার সুযোগ পাওয়া গেল।

বেশ ছোটবেলায় সিলেটে একবার চা কারখানায় চায়ের উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখার সুযোগ হয়েছিল। এর পরে আরও কয়েকবার চা বাগানে যাওয়া হলেও কারখানায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। সেসময় প্রচুর লোককে কারখানায় কাজ করতে দেখেছিলাম। এবার দেখলাম প্রায় পুরো প্রক্রিয়াটিই এখন মেশিনে হচ্ছে। বছরে তিনমাস চায়ের উৎপাদন বন্ধ থাকে - জানুয়ারি থেকে মার্চ। কপাল ভালো, শেষ মুহুর্তে এসে হাজির হয়েছি, নাহয় এ বছরও দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম।

জানা গেল, পাতার গুণগত মান আর আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আট দশ প্রকারের আ উৎপাদিত হয় এই এক কারখানা থেকেই। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট চায়ের দাম প্রতি কেজি বাংলাদেশি টাকায় ৭৫৫০০ টাকা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। জানলাম এই চায়ের পুরোটাই রপ্তানী করা হয়।

কারখানা বেড়িয়ে আসার পর শাহিন ভাই আমাদের দুইজনকে চা খাওয়ালেন। রঙ চা। চিনি আর চা পাতা ছাড়া আর কিছু দেয়া হয় নি। সুন্দর, হালকা রঙ হয়েছে। মুখের সামনে নিতেই চমৎকার ঘ্রাণ পাওয়া গেল। যেই মুহুর্তে চুমুক দিলাম, বুঝে গেলাম, আমার জীবনে খাওয়া সকল চায়ের মধ্যে এটাই সেরা। এই স্বাদের চা আগে কখনোই খাওয়া হয়নি। জানতে চাইলাম, এটাই কি এক নাম্বার গ্রেডের চা? শাহিন ভাই না বোধক উত্তর

দিলেন। চা পরিবেশনকারী ছেলেটার উত্তর থেকে বোঝা গেল - পাঁচ বা ছয় নাম্বার গ্রেডের চা খেয়েছি আমরা। এক নাম্বার চায়ের স্বাদ তবে কিরকম হবে?

শাহিন ভাই আরেকটি সুযোগ করে দিলেন - রিসোর্ট ঘুরে দেখা। চমৎকার গাছপালায় ছাওয়া শান্ত নিরিবিলি এলাকায় গোটা দশেক রাজকীয় বাংলো। বাংলোগুলোর মাঝ দিয়ে মহানন্দা নদীর সাথে সংযুক্ত খাল বয়ে গেছে। খালে স্বচ্ছ পানি কুলকুল করে বয়ে চলছে। সবুজ ঘাসে মোড়ানো অত্যন্ত পরিপাটি উঠান। সেখানে দুটি ঘোড়া ঘাস খেয়ে চলছে। এক জায়গায় দুটি পরিত্যক্ত ঘোড়ার গাড়িও দেখলাম। সম্ভবত অতিথিদের নিয়ে বেড়ানোর জন্য গাড়িগুলি ব্যবহৃত হত। বড় আকারের সমাবেশের জন্য গোলাকৃতির একটি মঞ্চ আছে। কর্মকর্তাদের থাকার জন্য কেবিনও আছে। সব মিলিয়ে এরকম একটি অসাধারণ পরিবেশ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাওয়া যাবে তা কল্পনাতীত।

এই বাংলোগুলোয় থাকতে আপত্তি করবে এমন মানুষ বোধহয় দুনিয়ায় নেই। মজার ব্যাপার হল - এই রিসোর্টে থাকার অনুমতিও সকলের নেই। এটি কেবলমাত্র মালিকপক্ষের অতিথি বিশেষ করে ব্যবসায়িক অতিথিদের জন্য বরাদ্দ। রিসোর্ট থেকে বের হওয়ার পর আমরা দুজনেই একমত হলাম - এটুকু দেখা না হলে সত্যিই বিশাল মিস হয়ে যেত!

বিপদ!

কাজী এন্ড কাজী টি এস্টেট থেকে সবে বেরিয়ে ভ্যানরিকশার জন্য অপেক্ষা করছি এমন সময় এক সাথে বেশ কয়েকটি এসএমএস আসল। চেক করে দেখলাম - মিসড কল এলার্ট। দুইটি নাম্বার থেকে কল করার চেষ্টা হয়েছে। বাগানের ভেতরে নেটওয়ার্ক দুর্বল, শোয়াইব যখন রত্না আপার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে তখনো সমস্যা করছিল এবং সম্ভবত এই কারণে কলগুলো আমার মোবাইল পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি।

নাম্বারগুলো আমার অপরিচিত। যেহেতু শোয়াইব বেশ কয়েকজনকে কল করার চেষ্টা করেছে, তাই শোয়াইবের দিকে মোবাইল বাড়িয়ে দিলাম, 'দেখো তো, এই নাম্বারগুলো চিনতে পারো কিনা, অনেকবার ট্রাই করেছে।'

শোয়াইব নাম্বারগুলো চিনতে পারলো না দেখে সবচেয়ে বেশি যে নাম্বার থেকে ট্রাই করা হয়েছে সেখানে কলব্যাক করলাম।

'হ্যালো? নাজমুল হাসান বলছেন?'
'জ্বী বলছি।'
'আমি এস আই মুমিন বলছি, তেঁতুলিয়া থানা থেকে।'
'জ্বী বলুন।'
'আপনারা এখন কোথায় আছেন?'
'আমরা কাজী এন্ড কাজী চা বাগান থেকে বের হয়েছি। এখন পঞ্চগড়ের দিকে যাবো।'
'নাজমুল সাহেব, আপনার সাথে যিনি ছিলেন, যমুনা টেলিভিশনের সাংবাদিক, শোয়াইব সাহেব, উনি কি আছেন?'
'জ্বী আছেন, আমরা একত্রেই ফিরবো।'
'আচ্ছা আচ্ছা। নাজমুল সাহেব, আপনারা একটু কষ্ট করে ডাকবাংলোতে আসতে পারবেন? আপনাদের সাথে একটু কথা ছিল।'
'কিন্তু আমরা তো এখন পঞ্চগড় যাবো, রাতের গাড়িতে ঢাকা ফিরবো, আমাদের টিকিট কাটতে হবে। আপনি ফোনেই বলুন প্লিজ।'
'নাজমুল সাহেব, এখানে একটি ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু আপনারা রাতে ডাকবাংলোয় ছিলেন, আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। ব্যাপারটা জরুরী।'
'কি হয়েছে ডাকবাংলোয়?'
'এখানে একটি লাশ পাওয়া গিয়েছে।'

ভ্রমণে গিয়ে যে কখনো কোন ঝামেলায় পড়িনি তা নয়, তবে সেগুলো নিতান্তই 'ঝামেলা', এবার যেটায় পড়তে চলেছি সেটা নিশ্চিত 'বিপদ'। পুলিশ আমাদের খুনি সাব্যস্ত করবে না সে ব্যাপারে আমরা দুজনেই নিশ্চিত, কারণ খুনটা আমরা করিনি, কিন্তু পুলিশি বিড়ম্বনা এড়ানো যাবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার উপায় পাওয়া যাচ্ছে না। যেহেতু আমাকে আগামীকাল ৭ ডিসেম্বর তারিখ সকাল দশটায় নতুন চাকরীতে জয়েন করতে হবে সেহেতু আমি কোন ঝামেলায় পড়তে চাচ্ছি না এবং এ কারণে আমি বেশ শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

আমরা বেশ কিছু জায়গায় ফোন করলাম। প্রথমে আমার এক বড় ভাই, উনি এডিশনাল এসপি, বর্তমানে ঢাকায় আছেন, তাকে ফোন করে ঘটনা খুলে বললাম। উনি আমার থেকে এস আই মুমিনের ফোন নাম্বার নিয়ে রাখলেন। আগামী এক ঘন্টার মধ্যে উনাকে আপডেট দেয়া না হলে তিনি সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ

করবেন। বার কয়েক পুলিশের সাথে কো-অপারেট করতে বললেন, আর বললেন প্রয়োজনে যেন উনার সাথে কথা বলিয়ে দেই।

তারপর শোয়াইব কথা বলল সেলিম ভাইয়ের সাথে। উনি ফোন ধরে কিছুক্ষণ ঝাড়লেন। আমাদের নাম্বারে পুলিশ যোগাযোগ করতে না পেরে প্রথমে নাজির সাহেব, তারপর ইউএনও-র সাথে কথা বলে আমাদের রেফারি সেলিম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেছে। তারপর থেকে উনি শোয়াইবকে অনেকবার চেষ্টা করেছেন। আমার নাম্বার উনার কাছে ছিল না বলে যোগাযোগ করতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত উনি জানতে চাইলেন আমরা সত্যিই কোন মেয়েকে ডাকবাংলোয় নিয়ে গেছি কিনা, মদ গাঁজা খেয়েছি কিনা। শোয়াইব আশ্বস্ত করলো দুটোর কোনটাই আমরা করিনি, স্রেফ ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই আমরা পঞ্চগড় এসেছি এবং আজকেই ফিরে যাবো।

এরপর সেলিম ভাই বললেন ভয়ের কিছু নেই। এস আই মুমিন নতুন জয়েন করেছেন বলে তার সাথে সেলিম ভাইয়ের পরিচয় নেই। তবে তেঁতুলিয়া থানার ইন্সপেক্টরসহ পঞ্চগড় থানার সকল অফিসারকে তিনি ভালো করে চিনেন, তারাও উনাকে চিনেন। উনি যে কোন সহযোগিতা করতে পারবেন তবে আমরা যেন পুলিশকে সহযোগিতা করি। উনি ধারণা করলেন, আমাদেরকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দিবেন।

এরপরে আমরা আরও কিছু ফোন করলাম। শোয়াইবের অফিস, ছোট ভাই, আমার বড় ভাই ইত্যাদি। উদ্দেশ্য সবাইকে জানিয়ে রাখা যে আমরা এরকমম একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপডেট না জানালে তারা যেন আমাদের খোঁজ নিতে পারে।

ডাকবাংলোয় পৌছে দেখলাম প্রচুর লোক ভীড় করে আছে। পুলিশের সাথে কেয়ারটেকারও আছে। আমাদেরকে আসতে দেখে সে একজন পুলিশকে দেখিয়ে দিল। ভদ্রলোক এগিয়ে আসলেন। বুকের ব্যাজে নাম লেখা, মুমিন। আমি সালাম দিলাম, 'আমি নাজমুল হাসান। আমার সাথে কথা বলেছিলেন।'

তিনি আমাদেরকে ডাকবাংলোর কোনায় নিয়ে গেলেন। সকালে এই জায়গায় দাঁড়িয়েই আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিলাম। ডাকবাংলোর সীমানা প্রাচীরের বাইরে ঝোপের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'এখানে পড়ে ছিল লাশটা। একটা ইয়াং মেয়ে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে দেখে কেয়ারটেকার জামিল দেখতে আসে এবং লাশটা দেখতে পায়। তখন বেলা সাড়ে দশটার বাজে। প্রথমে সে নাজির সাহেবকে ফোন করে জানায়। নাজির সাহেবের পরামর্শমতো সে আমাদের থানায় ফোন করে এবং তারপর আমরা হাজির হই।'

'লাশটা কোথায়?' শোয়াইব জানতে চাইল।
'লাশটা পিকআপে তোলা হয়েছে। আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা। আসুন লাশটা দেখবেন।'

ডাকবাংলোর পেছনের দিকে, পার্কের সামনে গাড়িতে লাশ রেখে পাহাড়া দিচ্ছিল একজন কনস্টেবল। আমরা গাড়িতে উঠলে সে লাশের মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিল। সুন্দর মুখের তরুণী। কিন্তু এই মুখ আমাদের অপরিচিত।

'চিনতে পেরেছেন?'

'না, দেখিনি কখনো? কে ইনি?'

'জানি না, এখানকার কেউ না। কেউই চিনতে পারেনি।'

'কিভাবে মারা হয়েছে?'

'সম্ভবত গলা টিপে। শরীরে আর কোথাও ইনজুরি মার্ক নেই। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

'আমাদের কাজ কি শেষ? আর কোন ফরম্যালিটি আছে?'

'আপনারা কাইন্ডলি আমাদের সাথে থানায় যাবেন। আপনাদের একটা স্টেটমেন্ট দিতে হতে পারে। তাছাড়া থানার অনুমতি ছাড়া পঞ্চগড় ত্যাগ না করার ব্যাপারে নির্দেশনা থাকতে পারে। এজন্যও থানায় যাওয়া দরকার।'

'কিন্তু আপনাকে বলেছি আমার আগামীকাল সকাল দশটায় জয়েনিং। আমাকে তো যেতেই হবে।'

'ওরিড হবেন না প্লিজ। আমরা চেষ্টা করবো যেন আপনাদের কোন সমস্যা না হয়। কিন্তু কিছু ফরম্যালিটি মেইনটেইন করতে হয়। ওসব করতে যা সময় লাগে ততটুকু তো দিতেই হবে।'

অগত্যা আমরা পুলিশ ভ্যানে চড়ে থানার দিকে চললাম। যেতে যেতে এস আই মুমিনের সাথে কথাবার্তা হল। বিশেষ করে এই খুনের তদন্ত প্রক্রিয়া কিভাবে হবে সে নিয়ে কথা চলল কিছুক্ষণ। মামলা হবে, লোকাল থানা তদন্ত করবে, প্রয়োজনে বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে, তদন্ত রিপোর্ট জমা হবে ইত্যাদি বিস্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই কাজ এগোবে। সময় যত যাবে উত্তেজনা ততই কমবে, একসময় স্তিমিত হয়ে যাবে। সাধারণত অল্প সময়ের মধ্যেই খুনী ধরা পড়ে যায়। জীবন তো রহস্যগল্প নয়, অল্প কিছুদিনের পরিশ্রমেই অপরাধী ধরা পড়ে যায়, বাকী সময় যায় বিচারিক কার্যক্রমে।

তেঁতুলিয়া থানার ইন্সপেক্টর হলেন সালেহ আহমেদ। মধ্যবয়স্ক হাসিখুশি ভদ্রলোক। উনাকে দেখে চেনা চেনা মনে হল। এস আই সাহেব নিশ্চয়ই ফোনে তাকে আপডেট করেছেন। আমাদের তিনি সাদরে বরণ করে বললেন, 'শোয়াইব কে? আপনি?'

'না। আমি নাজমুল হাসান। এ শোয়াইব।'

'সেলিম সাহেব আপনার কথা বলেছেন। গতকাল সকালে উনার সাথে দেখা হয়েছিল মৌচাকে। আজ ফোনে আপনাদের কথা বলেছেন।'

আমি এবার চিনতে পারলাম। 'গতকাল আপনারা আমাদের পেছনের টেবিলে বসেছিলেন, না? আমি দেখেছিলাম, কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না।'

'জ্বী। সিভিল ড্রেসে ছিলাম তখন।'।

সালেহ সাহেব একজন পিয়নকে ডেকে চা আনার জন্য বললেন। আমি উনাকে আমার জরুরিয়তের কথা বললাম। তিনি আশ্বাস দিলেন বাসের টিকিটের জন্য দুশ্চিন্তা না করতে, তিনি ব্যবস্থা করে দিবেন।

'আপনারা কিছু জানতে পারেন নাই?' শোয়াইব জানতে চাইল।

'আমরা স্থানীয়দের সাথে কথা বলেছি।' এস আই মুমিন বললেন। 'এই মেয়েকে কেউ চিনতে পারে নি। তার মানে এই মেয়েটা এলাকার নয়। রংপুর বিভাগের সকল থানায় খোঁজ নেয়া হবে এখন, কোন মিসিং ক্লেইম থাকলে আমরা জেনে যাবো। তখন মিলিয়ে নেয়া যাবে।'

'কেউ কি আগে দেখেও নি? কেয়ারটেকার বা অন্য কেউ? সবার চোখ এড়িয়ে তো আসা সম্ভব না।'

'বাহির থেকে আসলে তো বাসে, অটো বা ভ্যান রিকশায় এসেছে। ট্রাকেও আসা সম্ভব। তবে মনে হয়না ট্রাকে এসেছে। খুন কি এখানেই হয়েছে?' যোগ করে আমি জানতে চাইলাম।

'লাশটা তাজা। ফরেনসিক রিপোর্ট আসলে সঠিক সময় জানা যাবে। তবে আমাদের প্রাথমিক ধারণা হল খুনটা হয়েছে রাত বারোটা থেকে ছয়টার মধ্যে এবং সেটা অন্য কোথাও। লাশ ফেলা হয়েছে পরে।' এস আই মুমিন বললেন।

'কিভাবে বুঝলেন এটা?'

'রাতে ফেললে কুয়াশায় ভেজা থাকতো। সেরকম মনে হয়নি। তাছাড়া যে ঝোপ থেকে মেয়েটাকে পাওয়া গেল তার অবস্থা দেখে মনে হয়নি খুব বেশি আগে লাশ সেখানে ফেলা হয়েছে।' বললেন মুমিন সাহেব।

'খুনটা কি ডাকবাংলোয় হয়েছে?'

'হতে পারে। সেজন্যই আপনাদের স্টেটমেন্ট প্রয়োজন। আপনারা করেন নি এটা প্রমাণ করতে পারবেন?'

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সাথে সাথে দিলাম না। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। ডাকবাংলোয় খুন হয়েছে এবং সে সময় কেবল আমরাই ছিলাম ডাকবাংলোয়। সুতরাং কেউ যদি আমাদের দিকে আঙ্গুল তুলে তাহলে আমাদের প্রমাণ করতেই হবে যে আমরা খুনটা করিনি। ভাগ্য ভালো যে এখানে আমরা সেলিম ভাইয়ের রেফারেন্সে এসেছি, ফলে একদম অপরিচিত কেউ নই। কিন্তু শোয়াইব যদি যমুনা টিভিতে চাকরী না করতো এবং সেলিম ভাইয়ের রেফারেন্সে আমরা না আসতাম তাহলে হয়তো এখনই গ্রেফতার হয়ে যেতাম। অবশ্য এখনো দুশ্চিন্তামুক্ত হবার মত কিছু ঘটেনি।

'জ্বি পারবো।' আমি মুখ খুললাম।

'কিভাবে?'

'আমরা পঞ্চগড় বেড়াতে এসেছি। সকালে নেমেছি এখানে। ঢাকা থেকে এখানে আসার টিকেট আমার পকেটেই আছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত জায়গায় গিয়েছি যত লোকের সাথে কথা বলেছি তারা সবাইই টেস্টিফাই করতে পারবে আমরা সত্যি বলেছি। তেঁতুলিয়ায় এসেছি দুপুরে। তারপর থেকে এখানেই আছি। এখানেও যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তারা বলবে যে আমরা সত্য বলেছি।'

ওসি সাহেব হাসলেন, 'মেয়েটাকে যে আপনারা খুন করেন নাই তা কিন্তু প্রমাণ হয় না।'

'হয়। খুন করার জন্য মেয়েটাকে আমরা কোথায় পাবো? সে লোকাল না। আমরাও সাথে করে নিয়ে আসিনি। তার মানে সে একা এসেছে বা অন্য কারও সাথে এসেছে। যার সাথেই আসুক, তাকে কেউ না কেউ দেখেছে। আপনারা খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

'এটা কনভিন্সিং যুক্তি।'

'খুনটা ডাকবাংলোয় হয়েছে সেটা বলছেন কেন?' শোয়াইব জানতে চাইল।

'কারণ একটা লাশ ক্যারি করা সহজ কাজ না। বিশেষ করে চোখ এড়িয়ে ক্যারি করা তো খুবই কঠিন।'

'আপনারা যা বলছেন সে অনুযায়ী ঐ সময়ে ডাকবাংলোয় কেবল আমরাই ছিলাম। খুনটা যদি আমরাই করি তাহলেও মেয়েটা আসলো কোথা থেকে?' আমি যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করলাম।

'সেটাই জানার চেষ্টা করছি। আপনারা কি অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি?'

'অস্বাভাবিক বলতে?'

'এই এমন কিছু যা খটকা লাগতে পারে। অপরিচিত লোক বা অন্য কিছু।'

'এমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। তোমার শোয়াইব?'

'না। তবে... '

'তবে?'

'রাতে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল আমাদের। অবশ্য শব্দটা কান্না কিনা সন্দেহ। কারণ আমরা ডাকবাংলো ঘুরে দেখেছি, কোন মানুষ ছিল না। বাতাস বা অন্য কারণে শব্দ হয়েছে ধরে নিয়ে আমরা ঘুমিয়ে গেছি। অবশ্য কান্নার মত শব্দ আর শোনাও যায় নি।'

'রাত কয়টা বাজে তখন?'

'তিনটা।'

'আপনারা পুরো ডাকবাংলো চেক করেছেন?'

'পুরোটা বলতে বিল্ডিং এর ভেতরটুকু আর বারান্দা থেকে বালবের আলোয় যা দেখা যায়।'

'কি দেখলেন?'

'কিছু না। কনফারেন্স রুম যেটা আছে সেটায় তালা থাকেনা। আমরা দরজা খুলে বাতি জ্বালিয়ে ভালো করে দেখেছি। কেউ বা কিছু ছিল না। পাশের করতোয়া এক রুমের দরজায় তালা দেয়া ছিল। ভেতরে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় নি। পাশে কমন টয়লেট, সেখানেও কিছু ছিল না।'

'ছাদে?'

'কেয়ারটেকার রাত এগারোটার দিকে ডাকবাংলোর মেইন গেটে তালা লাগিয়ে দিয়েছিল, সকালে আবার খুলে দিয়েছে। তাই ছাদে বা পেছনের দিকে যাওয়ার সুযোগ ছিল না।'

'মুমিন সাহেব, আপনি আবার একটু যান তো। কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলে দেখেন সে কিছু শুনেছে কিনা। ছাদটাও দেখবেন।'

'আমার একটা সাজেশন ছিল।' আমি বললাম।

'জ্বি বলুন।'

'তেঁতুলিয়া যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে এখানে বাহিরের লোকদের চেনা কঠিন হবে না। বাহিরের লোকরা কিছু কমন জায়গায় যায়। যেমন ডাকবাংল, পার্ক, হোটেল। এইসব জায়গায় মেয়েটার ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে।'

'এটা আমরা করতাম। আপনি যখন বলেছেন এখনই করে ফেলা যায়। মুমিন সাহেব আপনি পারবেন?'
'পারবো স্যার। সাথে যদি নজরুলকে দেন তাহলে সুবিধা হয় স্যার।'
'নিয়ে যান।'

এস আই মুমিন সাহেব বেরিয়ে গেলেন। সালেহ আহমেদ সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা একটা স্টেটমেন্ট লিখতে বসে গেলাম। সংক্ষেপে ঢাকা থেকে তেঁতুলিয়া আসা পর্যন্ত লিখে তেঁতুলিয়ার ঘটনাবলী অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত লিখলাম। এর মাঝে দুপুরের খাবার আসল। আমরা খেয়ে নিলাম। ফোন করে নাবিলের ঢাকাগামী বাসে সিট বুকিং দিলাম। কিছু সময় অলস ঘুরে বেড়ালাম। তিনটার দিকে একজন পিওন এসে জানালেন ওসি সাহেব আমাদের ডাকছেন। গিয়ে দেখলাম মুমিন সাহেব এবং আরেকজন নতুন লোক যার বুকের ব্যাজে নজরুল লেখা দাঁড়িয়ে আছেন। ওসি সাহেব আমাদের বসতে বললেন।

'মুমিন সাহেব। বলেন কি দেখলেন?'
'গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাইনি স্যার। বন্ধ রুম খুলে দেখেছি স্যার। পরিপাটি গোছানো রুম। ছাদ বা বাগানে কিছু পাই নাই।'
'কেয়ারটেকার কি বলে?'
'সে স্যার কিছু শুনতে পায় নাই। তার বাসা তো স্যার দেখেছেন, একটু দূরে। ওখান থেকে শুনতে পাওয়া একটু কষ্ট হবে যদি না খুব জোরে চিৎকার করা না হয়।'
'হুম। আর কেউ কিছু বলল?'
'স্যার, তারপর আমরা ছয়টা বাসের ড্রাইভার, কন্ডাক্টর বা হেলপারের সাথে কথা বলেছি। এরকম চেহারার কোন যাত্রী তারা বাসে তুলেনি বা নামায়নি। গতকাল এই রুটে চলেছে এরকম বাস বাকী আছে আরও চারটা। ওদের সমিতির অফিসে ছবি দিয়ে এসেছি, কেউ চিনতে পারলে জানাবে।'
'আজকে সকালে ডাকবাংলোর মোড় থেকে যাত্রী তুলেছে কেউ?'
'তুলেছে।' আমিই জবাব দিলাম। 'আমরা ডাকবাংলোর সামনে থেকে বাসে উঠে বাংলাবান্ধা গিয়েছি।'
'জ্বী স্যার, উনাদের কথা বলেছে এক হেলপার। তেঁতুলিয়ার দিকে যাওয়ার সময় ভোর থেকে এগারোটার মধ্যেও কয়েকজনকে তুলেছে স্যার। কিন্তু ওরা লোকাল।'
'কিভাবে বুঝলেন?'
'প্রায় সবাইই বাজারে নেমে গেছে। ড্রেস দেখে লোকালই মনে করেছে সবাই। এক মহিলা ছিল অবশ্য, উনি বাস থেকে নেমে পঞ্চগড়ের বাসে উঠেছেন।'
'হুম। হোটেল?'
'জ্বী স্যার। বাজারে যে কয়টা হোটেল আছে সেগুলায় গিয়েছিলাম। দুপুরে যারা হোটেলে খেয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচ ছয়জন মেয়ে ছিল যারা ঘুরতে এসেছে। কিন্তু এই মেয়েকে কেউ দেখেনি।'
'আমরা যখন দুপুরে বাংলা হোটেলে খেতে গিয়েছিলাম তখন একটা মেয়েকে দেখেছিলাম। অবশ্য চেহারা দেখতে পাইনি। আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসেছিল', বলল শোয়াইব।

'আমাদের দিকে ফিরলেও চেহারা দেখতে পারতাম না। নেকাবে ঢাকা ছিল মুখ। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ওদেরকে ডাকবাংলোতেও দেখেছিলাম আমরা।'

মনে হল ইন্সপেক্টর সাহেব একটু আগ্রহী হয়ে উঠলেন। 'ডাকবাংলোতে কখন দেখলেন? বলেন নি তো!'

'আমরা যখন বাস থেকে নেমে ডাকবাংলোয় রুমের চাবি বুঝে নিয়েছি তখন ডাকবাংলোর সিড়িতে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বসে ছিল। প্রেমিক-প্রেমিকা আরকি। আমাদের দেখে ওরা উঠে গেল। আমরাও রুমে ঢুকে গেলাম। পরে আমরা যখন খেতে গেলাম সেখানেও ওদের দেখেছি। আমরা খাওয়া শেষ করে ফেরার সময় কোনার দিকের টেবিলে বসে ছিল।'

'মেয়েটা কি এরকম দেখতে?' লাশের তোলা ছবি তুলে দেখালেন এস আই সাহেব।

'আমরা তো ওই মেয়েকে দেখিনি। নেকাবে ঢাকা ছিল। দেখলে খাবার সার্ভ করেছে যে ছেলেটা সে দেখবে।'

'আপনি ওয়েটারের সাথে কথা বলেছেন?', মুমিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন সালেহ সাহেব।

'স্যার বাংলা হোটেলের দ্বিতীয় শাখা যেটা ওখানে দুটো ছেলে খাবার সার্ভ করে। আমরা একটা ছেলের সাথে কথা বলেছি। অন্য ছেলেটা তখন ছিল না।'

'আপনি এক কাজ করুন। আরেকবার যান। দেখেন অন্য ছেলেটা এই মেয়েকে দেখেছে কিনা।'

'আমরা যাই সাথে?' শোয়াইব জানতে চাইল।

'যেতে পারেন' বলেই মত পাল্টালেন সালেহ সাহেব, 'আচ্ছা, আমিও যাই। নজরুল তোমার যাওয়ার দরকার নাই।'

মিনিট আষ্টেক পরেই আমরা বাজারে উপস্থিত হলাম। বিকেলের আলো নিভে যাবে আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। সেই হোটেলেটায় সন্ধ্যার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। খদ্দেরের উপস্থিতি অবশ্য অনেক কম। বাংলা হোটেলে কাস্টমার নেই একজনও। তারা সব ধোয়া মোছা শেষ করে গুছিয়ে নিচ্ছে। এস আই মুমিন সাহেব গিয়ে অন্য ছেলেটাকে নিয়ে এলেন। আমি তখন বেশ উত্তেজনার বোধ করছি।

'কি নাম তোমার?'

'রবিউল।'

'আচ্ছা রবিউল, উনাদেরকে গতকাল তোমার হোটেলে দেখেছো?'

'জ্বী স্যার। আমিই সার্ভ করেছি।'

'উনারা বলছেন সে সময় একটা জুটি খেতে এসেছিল, মেয়েটা বোরকা পড়া।'

'স্যার, বোরকা পড়া মেয়ে দুইজন এসেছিল। একজনের মুখ ঢাকা, আরেকজনের খোলা।'

'মুখ ঢাকা মেয়েটার চেহারা দেখেছিলে তুমি?'

'না স্যার। মুখ নিচু করে খাচ্ছিল দেখতে পারি নাই। আর ওরা এক্সট্রা কিছু অর্ডার করে নাই, তাই ওদের টেবিলের কাছে গেছি কম।'

এই উত্তর আমার উত্তেজনায় পানি ঢেলে দিল যেন।

'কেউ দেখে নাই সেই মেয়েকে? দেখো তো এই মেয়ে কিনা?'

'আমি স্যার চিনতে পারতেছি না। মামুনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন?'

'মামুন কে?'

'টেবিল মুছে যে ছেলেটা ওর নাম মামুন।'

'কই ডাকো তারে।'

মিনিট পাঁচেক পড়ে একটা আট দশ বছর বয়সী ছেলেকে হাতে ধরে নিয়ে আসল রবিউল। চিনলাম ছেলেটাকে। গতকাল টেবিল পরিষ্কার করেছিল সে। ছেলেটা একটু ভীতসন্ত্রস্ত।

'এই ছবির মেয়েটাকে চিনো তুমি, মামুন?'

মামুন নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

'ভালো করে দেখ। গতকাল তোমাদের হোটেলে দুপুরে খেতে আসছিল। বোরকা পড়া, মুখ ঢাকা ছিল। মনে পড়ে?'

এইবার সে হ্যাঁ-বাচক মাথা ঝাঁকালো।

'সত্যিই চিনতেছো? নাকি আমি বলছি বলে বলতেছো?'

আশেপাশের সবাই মিলে তাকে অভয় দিল।

'চিনছি', শোনা যায় না এমন স্বরে বলল সে।

'কিভাবে চিনলা? চেহারা দেখছিলা তুমি?'

'টেবিল মোছার সময় আমার কাছে টিস্যু চাইল, তখন দেখলাম।'

এস আই মুমিনের দিকে ফিরলেন ওসি সাহেব। 'মুমিন সাহেব, আপনি ওই বাসের হেলপারকে খুঁজে বের করেন যেটায় চড়ে বোরকা পড়া মহিলাটা পঞ্চগড়ের দিকে গিয়েছে। কোথায় নেমেছে সেটা জেনে নিন। তারপর সেই থানায় বিস্তারিত জানিয়ে সাহায্য চাইতে হবে। বোরকা পড়া মেয়েটা আসলে মেয়ে ছিল না, তার প্রেমিকটিই বোরকা পরে পালিয়েছে। আর এ কারণেই মেয়েটিকে কেউ চিনতে পারেনি, কারণ তার চেহারাই কেউ দেখতে পায় নি।'

পরিশিষ্ট

সকাল দশটায় নতুন কর্মস্থলে যোগ দেয়ার কথা থাকলেও আমি সময়মত উপস্থিত হতে পারিনি। থানার স্টেটমেন্টে কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছিল, ফলে বুকিং করা বাস ধরতে পারি নি। রাতের তৃতীয় বাসে তুলে দিয়েছিলেন ওসি সাহেব। টাংগাইলের কুখ্যাত জ্যাম ঠেলে ঢাকায় ঢুকতেই সময় লাগল এগারোটা। অফিসে হাজির হলাম সাড়ে বারোটায়।

খুনী ছেলেটা ধরা পড়ল ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে। নিজ বাড়িতেই ছিল সে। নিহত মেয়েটা তার পরকীয়া প্রেমিকা, পাশের গ্রামে বাড়ি। খুনটা ঠিক কি কারণে করেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি

সে। একবার বলেছে মেয়েটা বিয়ের জন্য চাপ এবং হুমকী দিচ্ছিল বলে খুন করতে বাধ্য হয়েছে সে। পরে আবার অস্বীকারও করেছে। তবে স্বীকার করেছে খুনটা তার দ্বারাই হয়েছে।

খুনী ধরা পড়েছে জানার পরেও কিছু রহস্য থেকে যায় – খুনটা কোথায় হয়েছে? উত্তরটা জানার পর আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম! ডাকবাংলোতে আমাদের পাশের রুমেই, করতোয়া ১- এ। আমরা যে নারী কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম সেটা সত্যিই ছিল। কিন্তু সেই কক্ষে তারা প্রবেশ করলো কিভাবে?

কোন অতিপ্রাকৃত উপায়ে নয় – আমরা যেভাবে প্রবেশ করেছি সেভাবেই, দরজা দিয়ে। পার্থক্য হল, আমরা বৈধভাবে থেকেছিলাম, আর তারা কেয়ারটেকারের জামিলের সহায়তায়। বেচারা কেয়ারটেকার! অতিরিক্ত কিছু আয়ের লোভে মাঝেমধ্যে অন্যায়ভাবে ভাড়া দিত সে, বাহির থেকে দরজার তালা লাগিয়ে দিয়েছিল যেন আমরা বুঝতে না পারি। তবে সে খুনের সহযোগী নয়, লাশটাও সে সরায়নি। আমরা বের হয়ে আসার ঘন্টাখানেক পর সে অন্য কক্ষের অতিথিদের ডাকতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে আশেপাশে দেখতে গিয়ে লাশটা খুঁজে পায়। গুরুতর আরেকটি অন্যায় সে করেছিল, নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য করতোয়া ১ কক্ষটি সে পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলেছিল যেন কারো রাত্রিবাসের চিহ্ন না থাকে। এ জন্য তার সাজা হবে কিনা তা ভবিষ্যতে জানা যাবে, আপাতত সে সাসপেন্ডেড, সম্ভবত চাকরীটিও হারাবে।

আমার নতুন অফিস মতিঝিলে। মিরপুর থেকে আসা যাওয়ায় প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। বাসে অলস সময়ে বসে স্মার্টফোনে লিখেছি এই সম্পূর্ণ ভ্রমণকাহিনী এবং এডভেঞ্চার। এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে একটি থাকলেই সারা জীবন গল্প করার জন্য যথেষ্ট। আপাতত অফিস করি আর নতুন নতুন জায়গায় বেড়ানোর স্বপ্ন দেখি।

এই হল শোয়াইব!